আশুতোষ ও সমকালীন প্রসঙ্গ

আশুতোষ

ও

সমকালীন প্রসঙ্গ

সৌজন্য

ক্লোরাইড্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

আশুতোষ কলেজ প্লাটিনাম জুবিলি (১৯৯০-'৯১) কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকঃ

ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী
অধ্যক্ষ/সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ প্লাটিনাম জুবিলী (১৯৯০-১৯৯১)
উদ্‌যাপন কমিটি
জুলাই ১৭, ১৯৯০

প্রধান সম্পাদকঃ

অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলীঃ

অধ্যাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
" সলিল গঙ্গোপাধ্যায়
" স্বপনকুমার দাস
" উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য
" অমল চক্রবর্তী
" প্রণবকান্তি বসু

প্রচ্ছদঃ

অধ্যাপক উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য

মুদ্রকঃ

শশাংকশেখর ঘোষ
এস, জি এ্যান্ড কোং
২৫/৮, ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৮
ফোন—৭৭-১৫৭৭

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	পূর্বভাষ	অধ্যক্ষ শুভঙ্কর চক্রবর্তী	...	৭
২।	নিবেদন	অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯
৩।	আশুতোষ কলেজের কথা	পরিমলভূষণ কর	...	১৩
৪।	আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা	কান্তি বিশ্বাস	...	২৫
৫।	আইন্‌বিদ আশুতোষ	অমিত সেন	...	৩১
৬।	আশুতোষ ও বিজ্ঞান-শিক্ষা	স্বপনকুমার দাস	...	৩৭
৭।	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশুতোষের শিক্ষানীতির ভূমিকা	সুব্রত গুপ্ত	...	৪৬
৮।	আশুতোষ : তাঁর সমকাল ও রাজনৈতিক মানস	লাডলীমোহন রায়চৌধুরী	...	৫২
৯।	আশুতোষ কালপর্যায়ের ভারত	রনেন ঘোষ	...	৬০
১০।	বিশ্ববিদ্যালয় : সেকাল ও একাল	রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	৬৬
১১।	**Urbanism and Class formation in 19th Century Calcutta**	**Pradip Sinha**	...	৭৪
১২।	সাহিত্য, ফোকলোর এবং গণসংযোগের সমস্যা	ক্ষেত্র গুপ্ত	...	৭৯
	পরিশিষ্ট		...	৯৭
১।	লর্ড লিটনকে লেখা আশুতোষের পত্র			
২।	রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তদানীন্তন সভাপতির বাণী			
৩।	রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের বাণী			

পূর্বভাষ

ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আশুতোষ দেশের শিক্ষাজগৎ ও চিত্তজগতের এক গৌরবী ঐতিহ্য। দেশের গৌরবী ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সমীচীন হবে তাঁকে তাঁর সময়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে বিচার করার মধ্যে। একালের চাহিদা সেকালে তাঁর মধ্যে পূরণ হলো না বলে তাঁর প্রতি বিরূপ হওয়া কাম্য নয়। স্বযুগে দাঁড়িয়ে তিনি যে কর্মোদ্যোগ নিয়েছেন, তা কতটা বর্তমানের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম, কতোটা আজও প্রাসঙ্গিক সেই বিচারই হবে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই নিছক অতীত ও অতীতঐহিত্য নির্ণীত হয়। গৌরবী ঐতিহ্য আজ আমাদের বড়ো দরকার।

আশুতোষ পরাধীন দেশে প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষার বিস্তারের জন্য অনলস চেষ্টা চালিয়েছেন, সার্বজনীন জাতীয় উচ্চশিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার ও তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিংহাসন পেতে দেবার প্রচেষ্টা করেছেন, বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের জন্য ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন—এসবই তাঁর কর্ম উদ্যোগের গণতান্ত্রিক উপাদান যা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই উদ্যোগকে সফল করতে অনেক সময় তাঁকে ইংরেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধতা করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শাসকপ্রভু কার্জন, লিটন, ফুলারের সঙ্গে সংঘাতে নামতে হয়েছে। ইংরেজশাসক ভেবেছিল এই অরাজ-নৈতিক পণ্ডিত ব্যক্তি সরকারের লোক হয়ে তাদের পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু আশুতোষ তাদের হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছেন। এ সবই আশুতোষের চিন্তা ও কর্মধারার গৌরব করার দিক। এই উজ্জ্বল দিক সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

আশুতোষের প্রতিভার আরেক স্মরণীয় দিক হলো, ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতির জন্য তাঁর ভাবনা। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষার বিস্তার এবং ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রতি অনুরাগ ও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় অখণ্ডতার পরিপুষ্টি সম্ভব। ভারতীয় অখণ্ডতার পথে জাতীয় সাহিত্যকে তিনি একটি সাধারণ উপায় মনে করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই ভিত্তিস্থাপনের মধ্য দিয়ে যে "Unification of thought and culture" জন্মাবে তারই ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে। এই চিন্তার মধ্যে ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর দেশপ্রেমের যে আন্তরিক আবেগ ফুটে উঠেছে, আমাদের কাছে আজ তা খুবই প্রাসঙ্গিক।

এই প্রাসঙ্গিকতাই আশুতোষের প্রতিভার ঐতিহ্যের দিক। এখানেই দেশের শিক্ষাজগৎ ও চিন্তাজগৎ আশুতোষের কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রাসঙ্গিকতার সূত্রেই আশুতোষ কলেজের 'প্লাটিনাম জয়ন্তী' বর্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। আশুতোষের মূল্যায়নে আমাদের এই প্রয়াসে যে সকল গুণী ব্যক্তিরা লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন, অর্থানুকূল্যে যাঁরা সহায়তা করেছেন, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

নিবেদন

অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের নানারূপ পরিচয়ের একটি হল, সে শিক্ষাশ্রয়ী জীব। দেখে, শুনে শিক্ষা লাভ হতে পারে, নানা অবস্থা ও ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে (যাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলি) শিক্ষা লাভ হয়। তদুপরি মানুষ শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। প্রাচীন ভারতের "আশ্রম" ব্যবস্থা বা গ্রীসের প্রাচীন পণ্ডিতদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই আনুষ্ঠানিক ও বিধিসম্মত শিক্ষাদানের কথা বলা আছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। উপরন্তু, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেরূপ প্রাচীনত্বের অধিকারী হবে, সেইমত বৃহত্তর সমাজে ব্যাপকতর প্রভাব সৃষ্টিতেও সে সক্ষম হবে। দক্ষিণ কলকাতার এরূপই অনন্যসাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আশুতোষ কলেজ তার দীর্ঘ পঁচাত্তর বছরের নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারায় কত লক্ষ যুবক-যুবতীকে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছে, কত মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে, কত শিক্ষক-অধ্যাপকের জীবনে সার্থকতা এনেছে তার গাণিতিক হিসাব নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন কেবল এই বিশেষ বিশেষ ক্ষণ বা পর্যায়গুলোকে স্মরণ করার উপযুক্ত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিভিন্ন জয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যায়তনের এক একটি পর্বকে স্মরণে রাখার চেষ্টা চলে। আশুতোষ কলেজেও ইতিপূর্বে বিভিন্ন পর্বের জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

আগেকার জয়ন্তীগুলোর মধ্যে রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পাঠান সভাপতি শ্রী শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাণী এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ শ্রী পঞ্চানন সিংহ মহাশয়ের বাণীগুলো এখানে পুনঃমুদ্রণ করা হল। পঁচাত্তর বছর বা প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবটি আমরা একটু ভিন্ন ভাবে সারা বছর ধরেই পালন করার পরিকল্পনা নিয়েছি। আর এই পরিকল্পনার শুরুতেই রয়েছে বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশনা। আমরা চেয়েছি বিজ্ঞাপন-লাঞ্ছিত হাল্কা স্মারক গ্রন্থ মাত্র প্রকাশ না করে এই সুযোগে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী-আগ্রহ সৃষ্টিকারী, গবেষণা-ধর্মী লেখায় পুষ্ট, একটি মনোগ্রাহী গ্রন্থ প্রকাশ করতে। গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে স্বভাবতই আমরা যে কর্মবীর ও জ্ঞানবীরের নামে এই কলেজ সেই আশুতোষ ও তাঁর সময়ের কথাই বেছে নিয়েছি।

এক্ষণে গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়গুলো ও তাদের লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপ-স্থাপিত হল।

বর্তমান গ্রন্থের উপলক্ষ হল আশুতোষ কলেজের পঁচাত্তরতম বছরটিকে উৎসবের বছর (প্লাটিনাম জয়ন্তী) হিসাবে স্মরণ করা। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই যে রচনাটি গ্রন্থের প্রথমেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হ'ল এই কলেজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা বেছে নিয়েছি সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘদিন কলেজের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক পরিমলভূষণ কর মহাশয়কে। আশুতোষ মেমোরিয়াল ইন্‌স্টিট্যুট্‌ নামে যে সংস্থাটি এই বিদ্যায়তন রক্ষণাবেক্ষণ ও নানা শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কাজে লিপ্ত, অধ্যাপক কর সেই সংস্থারও সম্পাদক। ফলত, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা উভয় দিক থেকেই উপযুক্ত মানুষটিকে দিয়েই আমরা কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি উপস্থাপিত করতে পেরেছি এ প্রত্যয় আমাদের রয়েছে। রচনাটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও মহৎ কীর্তিগুলোর কথা উল্লেখ করে শেষ হয়েছে। খুব সঙ্গতভাবেই।

শিক্ষাবিদ্ ও আইনবিদ্ উভয় প্রকার পরিচয় আশুতোষ একই সঙ্গে বহন করেছেন বললে যথেষ্ট বলা হয় না। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন তিনি নতুন ভাবনা-চিন্তাকে অভাবনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন, তেমনি আইনের ক্ষেত্রেও প্রধান বিচারপতি হিসাবে তিনি তাঁর বিশিষ্ট সমাজবোধ ও ইতিহাসবোধের ভিত্তিতে অগ্রগতি রায়দানের মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে তৎপর ছিলেন। তাই গ্রন্থের মূল বিষয় সংক্রান্ত প্রবন্ধ/রচনা নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা গোড়াতেই "আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা" ও "আইনবিদ্ স্যার আশুতোষ" নামে দুটি রচনা পর পর সন্নিবিষ্ট করেছি। ব্রিটিশ আমল থেকেই শিক্ষা সরকার নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে আশুতোষকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে যাঁরা শিক্ষার সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাঁরা আশুতোষের শিক্ষা-ভাবনাকে কিভাবে দেখছেন তা আমরা জানতে চেয়েছি। স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গ-রাজ্যের অন্যতম শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয় আমাদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন।

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত দু-একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার পরও আমাদের মনে হয় যে আইনশাস্ত্র পঠন-পাঠনের সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তির পক্ষেই আইনবিদ্ আশুতোষের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোগ্রাহী পরিচয় দেওয়া সহজ হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজের ডীন শ্রী অমিত সেন মহাশয় আমাদের সে ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

আইনকে যেমন আশুতোষ সামাজিক-নৈতিকতার আধার হিসাবে দেখতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা যেন সামাজিক প্রগতির সূচক হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন ছিল বিশেষভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার। বিজ্ঞান চিত্তকে মুক্ত করে, মানুষকে অন্ধকার-কুসংস্কার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যায় এরূপই ছিল আশুতোষের ধারণা। বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসারে আশুতোষ কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার একটি সরল বিবরণ আমাদের এক সহকর্মী অধ্যাপক স্বপন কুমার দাস সহজ ভাষায় হাজির করেছেন।

মৌলিক ও কার্যকরী চিন্তা-কর্মগুলো কোন স্বয়ম্ভূ প্রক্রিয়া নয়। Historical Specificity বা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি অবগত না করলে চিন্তা-কর্মগুলোর তাৎপর্য্য অনুধাবন করা কঠিন হয়। অর্থাৎ আশুতোষকে বুঝতে হলে তাঁর বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্যায় বা সহজ কথায় তাঁর সময় নিয়েও ভাবতে হয়। আমাদের গ্রন্থের নামকরণও অনরূপ চিন্তারই প্রতিফলন। আমাদের কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত যোগমায়া দেবী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী সুব্রত গুপ্ত শিক্ষার সঙ্গে আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার সম্পর্কটি বিবেচনা করেছেন। অর্থনীতিবিদ্ শ্রী গুপ্ত জানিয়েছেন যথাসম্ভব সকলের অক্ষরজ্ঞান এবং ঘরে ঘরে স্নাতক তৈয়ারী করার যে পরিকল্পনা আশুতোষ নিয়েছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা আজ তো সংগঠিত ভাবে বলা হচ্ছে। সেইমত কাজও হচ্ছে। Man-power বা মানব-শক্তির গুণগত উৎকর্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়ে চলার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে ইদানিংকালে ভিন্নতর ভাবনা দেখা যাচ্ছে। শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা অনেকের মনে অবশ্য এই প্রশ্ন তুলতে পারে, উচ্চশিক্ষার প্রসারের ধারণাটি ভারতের বর্তমান অবস্থায় প্রাসঙ্গিক কিনা।

আসলে শিক্ষাকে কেবল স্থূল উপযোগবাদী (utilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে হবে না। শিক্ষার তো প্রকার ভেদ রয়েছে। কোন কোন ধরণের শিক্ষা নিতান্তই

পেশাগত। কিন্তু এ ছাড়া রয়েছে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ। এই কারণে আশুতোষ বলেছিলেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের সুবন্দোবস্ত থাকবে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে কলা-বিভাগের অন্তর্গত বিষয়গুলো অধ্যয়নেও সমান সুযোগ পাবে। সব কিছু মিলিয়ে তাঁর মূল শ্লোগান ছিল সার্বজনীন শিক্ষা। শিক্ষার প্রক্রিয়াটি যেন বাধাহীন ভাবে চালু থাকে। কোন অবস্থায়, এমন কি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্যও তিনি শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা অসমীচীন বলে মনে করেন।

আশুতোষের সময় হল জাতীয় রাজনীতি গড়ে ওঠার সময়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তনের সময় থেকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ৪০ (চল্লিশ) বছরের ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি ও তার জটিল প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজনীতিবিদ্‌দের অনেকের সঙ্গে তার সুসম্পর্কও বজায় ছিল। অথচ তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিলেন না। চরম, নরম, বা বিপ্লববাদী কোন প্রকার গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিশেষ কোন সহানুভূতি ছিল এমনও জানা যায় না। তবে কি আশুতোষ অ-রাজনৈতিক (non-political) ধরণের মানুষ ছিলেন? ওইরকম কীর্তিমান পুরুষের পক্ষে কি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব? বিদ্যালয়-বয়কটের বিরোধিতা করে কি তিনি তাঁর মধ্যে দেশ-প্রেমের অভাব প্রদর্শন করেছেন? বিশিষ্ট ইতিহাস-গবেষক শ্রী লাড্‌লীমোহন রায়-চৌধুরী তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পরিচয় দিয়ে আশুতোষের রাজনৈতিক সত্তা সম্পর্কে নতুন আলোকপাতের প্রয়াস নিয়েছেন।

আশুতোষের সমকালীন আর্থনীতিক ও সমাজিক চিত্রটি এক লহমায় বুঝে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন বিশিষ্ট লেখক শ্রী রণেন ঘোষ। তৎকালীন ভারত ও বঙ্গদেশ সংক্রান্ত এই তথ্যগুলো পাঠকগণ নানা দিক থেকে বিচার করে দেখবেন।

আশুতোষের কথা শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে শিক্ষা-সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়ে। সরকারী সাহায্য, সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বাতন্ত্র্য—এই বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। আশুতোষ যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা করেছেন তা আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকগণ কিভাবে বিচার করছেন তা জানা যেতে পারে। বর্তমানকালের উপাচার্যগণ রাজনীতির চাপে জর্জরিত কেবল একথা বললে চলবে না। কেননা আশুতোষ উপাচার্য হিসাবে কেবল সরকারী আমলাদের বিরোধিতা পেয়েছেন তা নয়, প্রভাসচন্দ্র মিত্রের মত তথাকথিত কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ্‌ও তাঁর নানা কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন। রাজনীতিবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এই দ্বন্দ্বসম্পর্ক আজকাল কি চিত্র পরিগ্রহণ করেছে, তা নিয়ে লিখেছেন উপাচার্যের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এ যুগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ শ্রী রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। রমারঞ্জনবাবু তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই অনেক কথা বলেছেন। মতামত তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা অবশ্যই তাঁর নিজস্ব মতামত। আশুতোষ ও তাঁর প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বর্তমানের উপাচার্যগণ ও তাদের প্রতিপক্ষের তুলনামূলক আলোচনা টানলে মতামতগুলো বিচিত্রধর্মী তো হবেই। সবচেয়ে বড় কথা, উপাচার্য আশুতোষের মত দৃঢ়তার, আত্মপ্রত্যয়ের ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি একান্তভাবে নিয়োজিত থাকার দৃষ্টান্ত আর কোথায়?

আশুতোষের বাসস্থান কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে, কলেজের কাছাকাছি। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রও এই শহর—শহরের আদালত, হাইকোর্ট, শহরের অন্তর্গত বিশ্ব-

বিদ্যালয়। আজ এই শহরের তিনশ বছর পূর্তি উৎসব চলছে। পঁচাত্তর বছরের এই কলেজ তিনশ বছরের এই শহরের সমাজ জীবনের সঙ্গে কিভাবে, কতখানি সম্পৃক্ত রয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। বর্তমান গ্রন্থে আমরা সেই আলোচনার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। আশা রাখি উৎসব শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় একটি গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শহরের কথাও আলোচিত হবে। তথাপি এই গ্রন্থেই আশুতোষের সমকালীন কলকাতায় বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীগুলোর অবস্থান কিরূপ ছিল এবং শিক্ষালাভ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ এই শহর ও শহরতলীতে কিভাবে, কতটা বিস্তার লাভ করছিল তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি রচনা আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় খ্যাতিমান লেখক শ্রী প্রদীপ সিংহ মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

গ্রন্থটির সর্বশেষ রচনা হিসাবে যে লেখাটি সংযোজিত করা হল বাহ্যত তার সঙ্গে আশুতোষ বা তাঁর "সময়"-এর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই মনে হতে পারে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রী ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় যে প্রবন্ধটি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা একটি গভীর তত্ত্ব-চিন্তা সমৃদ্ধ আলোচনা। আশুতোষ শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের কথা ভেবেছিলেন। ক্ষেত্রবাবু Folklore বা লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন। বলা বাহুল্য, লোকসাহিত্য উপেক্ষা করে জাতীয় সাহিত্যের ভাবনা সুসম্পূর্ণ হতে পারে না। তত্ত্বগতভাবে যে প্রসঙ্গটি আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল সাধারণ মানুষের জানার সমস্যা, তার সচেতনতা ও শিক্ষা প্রসারের সমস্যা। আশুতোষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার চেয়েছেন। কিন্তু আজ এই ১৯৯০ সালেও, সাহিত্যের পাঠক ক'জন? ইদানীংকালে নানা 'media' বা গণসংযোগ মাধ্যমের প্রসার ঘটেছে। রেডিও, সংবাদপত্র ও টি. ভি.'র কথা বাদ দিলে নাটক, যাত্রা, পালা-গান প্রভৃতির কথাও বলা যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়গুলো কিভাবে কতখানি বৃহত্তর পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে পেঁছিতে পারছে বা পারছে কিনা তার তত্ত্ব ও তথ্যগত বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশুতোষের প্রত্যয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হলে তা কালক্রমে বৃহত্তর জনসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অর্থাৎ সার্বজনীন শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে তিনি উচ্চশিক্ষার প্রসারকেই নির্দেশ করেছিলেন। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত'র লেখায় আমরা সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির এই অনুস্রাবন প্রক্রিয়ার (Percolation Process) প্রশ্ন নিয়ে এক মনোজ্ঞ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাব। সুতরাং বাহ্যত যাই মনে হোক না কেন প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমান গ্রন্থের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই এই প্রবন্ধটি পাঠকদের মন ও মননকে আন্দোলিত করবে এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ইউরোপে যাকে রেনেসাঁস বলে তার সূত্রপাত ও প্রসার হয়েছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরে। পরবর্তীকালে অবশ্য রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দেখা যায়, বঙ্গদেশ তথা ভারতেও শিক্ষা-সংস্কৃতির যে জোয়ার ঊনবিংশ শতকে এসেছিল, তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু, আশুতোষ বাংলা তথা ভারতের সেই রেনেসাঁসকে প্রাতিষ্ঠানিক-ব্যবস্থাগত রূপদান করে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে গুণগত উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন, তা এককথায় অতুলনীয় অভূতপূর্ব। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সেই আনুষ্ঠানিক রেনেসাঁসের-ই একটি স্মরণিকা বলে গণ্য হবে আশা করি।

আশুতোষ কলেজের কথা

পরিমল কর

আশুতোষ কলেজ পঁচাত্তর বৎসরে পদার্পণ করল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কলেজ কিভাবে নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে বিকশিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া সঙ্গত। কারণ, যাঁরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের আদর্শে নূতনভাবে অবগাহন করে আমাদের এই বিদ্যায়তনটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। আশুতোষ কলেজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতমাতার দু'জন কৃতী সন্তানের নাম জড়িত। একজন হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং অপরজন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এঁরা দু'জনই উদার কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং নানা উপায়ে অবিভক্ত বাঙলার, তথা সমস্ত ভারতবর্ষের, জ্ঞানসম্পদের ভিত্তি স্থাপন করতে উদ্যোগী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ প্রমুখ কয়েকজন সুযোগ্য এবং ত্যাগী অধ্যাপককেও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে হয় যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে সূচনা পর্বে বিদ্যায়তনকে দাঁড় করাতে সাহায্য করেছিলেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও অধুনা দক্ষিণ কলকাতা বলতে যা বোঝায় সেই অঞ্চল কলকাতা শহরের শহরতলি বলেই গণ্য হ'ত। এই শহরতলিতে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির নাম The General Committee of the South Suburban Group of Schools. এই সমিতির উদ্যোগে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

১৯১১ সালে ভবানীপুরের London Missionary Society's Institution এবং Doveton College তুলে দেওয়া হয়। উপরোক্ত কলেজ ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বলা বাহুল্য যে এই কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ-সমূহের প্রাচীনতম বিদ্যায়তন। এই কলেজ উঠে যাওয়ায় কলকাতা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। এই সংকট নিরসনের উপায় নির্ধারণের জন্য জেনারেল কমিটির তদানীন্তন সভাপতি স্যার আশুতোষ ভবানীপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি চেয়ে তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়। এই আবেদনে ভবানীপুর অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগের অভাবে ছেলেমেয়েরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল তার উল্লেখ করা হয়। এই আবেদনে সাউথ সুবার্বণ স্কুলকে উন্নীত করে Intermediate ক্লাশ করার জন্য একটি Junior College গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয়, জুলাই মাসে তদানীন্তন বাঙলার গভর্ণর কারমাইকেলের

একান্ত সচিব জেনারেল কমিটিকে জানিয়ে দেন যে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে না।

তারপর অনেক লেখালেখি এবং আলোচনার ফলে ১৯১৬ সালের মে মাসে ভারত সরকারের অনুমোদন সম্বলিত চিঠি জেনারেল কমিটির কাছে পৌঁছয়। এই চিঠিতে ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বণ স্কুলের সংশ্লিষ্ট জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হয়। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পড়াবার অনুমোদন পাওয়া যায়ঃ ইংরাজী, বাঙলা, সংস্কৃত, লজিক, অঙ্ক এবং উদ্ভিদবিদ্যা।

১৯১৫ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে জেনারেল কমিটির সভায় এই নূতন কলেজের গভর্ণিং বডির গঠন-সম্পর্কিত নিয়মাবলী অনুমোদিত হয়। দশ জন সদস্য-সম্বলিত একটি গভর্ণিং বডির উপর কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই দশ জন সদস্যের মধ্যে আট জন সদস্য এক বৎসরের জন্য জেনারেল কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হবেন। বাকি দুই জন সদস্য হলেন অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের দ্বারা এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি। জেনারেল কমিটির তত্ত্বাবধানে গভর্ণিং বডি কলেজের কাজকর্ম পরিচালনা করবেন বলে স্থির হয়।

১৯১৬ সালের ৩রা জুন স্যার আশুতোষ গভর্ণিং বডির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভাতেই কলেজের নামকরণ করা হয় সাউথ সুবার্বন কলেজ, ভবানীপুর। আরেকটি প্রস্তাবে ঠিক হয় যে এই কলেজ ২৬নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের কাজকর্ম শুরু হয় ১৯১৬ সালের ১৭ই জুলাই থেকে। এই তারিখে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাশ আরম্ভ হয়। প্রথম শিক্ষাবর্ষে মোট ২৮৮ জন ছাত্র ছিল। প্রথম বর্ষে ১৮৩ জন এবং দ্বিতীয় বর্ষে ১০৫ জন।

প্রথম শিক্ষাবর্ষে কলেজ অপ্রত্যাশিত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ পরের বৎসর তদানীন্তন রসা রোডের ১৫৭ নম্বর বাড়িতে কলেজ স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই বাড়িটি 'বিজনী হাউস' বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এই বাড়ি ভেঙ্গে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের ছেলেদের কলেজে যাতায়াত করার দিক থেকে এই বাড়িটি অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কলকাতা শহরের দক্ষিণ শহরতলি খুব তাড়াতাড়ি সম্প্রসারিত হচ্ছিল। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের তরফ থেকে নানা প্রকার উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় লোকবসতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই পরিবর্তিত পরিবেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে Intermediate College কে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করার প্রস্তাব করেন। ১৯১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে। তদনুযায়ী নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ডিগ্রী ক্লাশে পড়াবার ব্যবস্থা হয়ঃ ইংরাজী, বাঙলা, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি (তখন বলা হ'ত Political Economy and Political Philosophy) এবং অঙ্ক।

বিশ দশক থেকে কলেজের সম্প্রসারণ এবং অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে বিজ্ঞানের বিষয় পড়াবার অনুমোদন পাওয়া যায়। তার তিন বৎসর পর ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি. এস্‌সি ক্লাশ শুরু হয়। ১৯১৬ সালে ২৮৮ জন ছাত্র নিয়ে কলেজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায়

দু' হাজার পাঁচ শ। ১৯১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগে মাত্র সাতটি বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা ছিল ডিগ্রী ক্লাশে। বর্তমানে ১৬টি বিষয়ে (কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে) অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা আছে। বিশ দশকে দক্ষিণ কলকাতার সম্প্রসারণের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ পঠন-পাঠনে বৈচিত্র্য আনতে সচেষ্ট হন। পঞ্চাশ দশকে ভারত-বিভাগের ফলে পূর্ব বাঙ্‌লা থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেদের কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্ব বাঙ্‌লা থেকে আগত কয়েকজন সুপণ্ডিত এবং কৃতী অধ্যাপককে আশুতোষ কলেজে স্থান দেওয়া হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যানুরাগের ফলেই এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

বিশ দশকে যখন কলেজ নানা শাখাপ্রশাখায় সবে পল্লবিত হতে আরম্ভ করেছে, তখন হঠাৎ ১৯২৪ সালের ২৫শে মে তারিখে কলেজের কর্ণধার স্যার আশুতোষের মৃত্যু ঘটে। এই ক্ষতি অপূরণীয়। ১৯১৬ সাল থেকে তিনি কলেজ পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এবং তাঁর অমূল্য উপদেশ ও সক্রিয় চেষ্টার ফলে কলেজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবিভক্ত বাঙ্‌লার শিক্ষা-জগতে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৯২৪ সালের ১৫ই জুনের সভায় কলেজের পরিচালক-মণ্ডলী সাউথ সুবার্বন স্কুলের জেনারেল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সাউথ সুবার্বন কলেজের নাম পরিবর্তন করে আশুতোষ কলেজ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলেজ পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আজীবন এই পদ অলঙ্কৃত করেন। আশুতোষ কলেজ ১৯২৭ সালের ৩০শে মার্চ Societies' Registration Act, 1860, অনুযায়ী নিবন্ধভুক্ত হয়।

১৯২৯ সালে আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য স্যার আশুতোষের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা। নিবন্ধভুক্ত হবার পর ইনস্টিটিউট কলকাতা করপোরেশনের নিকট আশুতোষের স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করার জন্য এক খণ্ড জমির জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে করপোরেশন হাজরা পার্কের উত্তর দিকের এক বিঘা চৌদ্দ কাঠা জমি ইনস্টিটিউটকে ইজারাবলে অধিগ্রহণ করতে অনুমতি দেন। এই জমিতে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল, আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী এবং আশুতোষ কলেজ স্থাপিত হয়। বিজনী হাউসে প্রায় দুই দশক কাটাবার পর আশুতোষ কলেজ ১৯৩৫ সালে এই নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

আশুতোষ মেমোরিয়াল হল

আশুতোষ মেমোরিয়াল হল তৈরি হ'বার পর কয়েক দশক ধরে এই হল দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। নাটক, সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা, সেমিনার এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা এই হলে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হ'ত। উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নাটক "পরিশোধ" ১৯৩৬ আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ-কারী অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশে মেমোরিয়াল হল মুখর হয়ে থাকত।

আশুতোষের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী সভা ১৯২৫ সালের ২৬শে মে অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, আশুতোষের সঙ্গে তাঁর কোন সময় সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকাকালীন তিনি আশুতোষের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের বিষয় জানতে পেরেছেন। ব্রিটিশ ভাইসরয়ের সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ে আশুতোষ যে সংগ্রাম করেছিলেন গান্ধীজী শ্রদ্ধাসহকারে তার-ও উল্লেখ করেন। এই সভাতেই আশুতোষের স্মৃতি-রক্ষার্থে মেমোরিয়াল হল নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

যখন আশুতোষ কলেজ ও আশুতোষ মেমোরিয়াল হলের নির্মাণকার্য শেষ হয়, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল হলের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান। অসুস্থ থাকায় কবি আসতে পারেননি। তিনি আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্র লিখে পাঠানঃ

স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একদা তোমার নামে সরস্বতী রাখিলা স্বাক্ষর,
তোমার জীবন তাঁর মহিমা ঘোষিল নিরন্তর।
এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত করুক তাঁরি জয়
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব হউক অক্ষয়।

Once the Goddess of Wisdom
left her own signature
upon your name,
and you maintained her majesty
with all your life,
Let that name of yours ever proclaim her triumph
Uniting your memory with her service
in this Temple of learning.

গত এক দশক যাবৎ মেট্রোরেলের খননকার্যের জন্য মেমোরিয়াল হল সাংঘাতিক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। সুখের বিষয়, মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট এবং তিন কলেজের কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় হলের সংস্কারকার্য আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মেমোরিয়াল হল আবার তার আগেকার গৌরব ফিরে পাবে এবং দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

প্রাতঃকালীন মহিলা কলেজ

দক্ষিণ কলকাতার মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষ মহিলাদের জন্য সকাল বেলা একটা শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালের জুন মাসে এই শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই শাখার নামকরণ করা হয় Asutosh College for Women. প্রথম বৎসর মাত্র ৫৫টি ছাত্রী নিয়ে কলেজ আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৪৮ সালে প্রাতঃকালীন শাখাকে দিবা কলেজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়া হয়। স্বতন্ত্র

অধ্যক্ষের অধীনে কলেজের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়। তবে দিবা কলেজ এবং সকালের কলেজ একই গভর্নিং বডির পরিচালনাধীন ছিল। ১৯৫৮ সালে দুই কলেজের মধ্যে এই যোগসূত্রও ছিন্ন করা হয়। স্বতন্ত্র গভর্ণিং বডির পরিচালনাধীন এই কলেজের নামকরণ করা হয় যোগমায়া দেবী কলেজ।

সান্ধ্য কলেজ

দিনে কর্মরত ছেলেরা যাতে সন্ধ্যার সময় commerce বিষয়ে পড়াশুনা করতে পারে, তার জন্য আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যাবেলা শাখা খুলে B. Com. পড়াবার অনুমোদন লাভ করেন। সান্ধ্য কলেজে B. Com. ক্লাশ শুরু হয় ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষা-বর্ষ থেকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়ে যাওয়ায় আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৮ সালে সান্ধ্য কলেজের জন্য পৃথক অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। অন্যান্য সব দিক থেকে সান্ধ্য কলেজকে দিবা কলেজ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। কিন্তু আশুতোষ কলেজের গভর্ণিং বডির তত্ত্বাবধানে সান্ধ্য কলেজ পরিচালিত হত। ১৯৫৮ সালে সকালের কলেজের মত সান্ধ্য কলেলেজর পরিচালনা একটি স্বতন্ত্র গভর্ণিং বডির উপর অর্পণ করা হয়। তখন এই কলেজের নামকরণ করা হয় শ্যামাপ্রসাদ কলেজ। পরবর্তী কালে শ্যামাপ্রসাদ কলেজ B.A. পড়াবার অনুমোদনও লাভ করে।

আশুতোষ কলেজগুচ্ছ

১৯৫৮-৫৯ শিক্ষা-বর্ষ থেকে প্রাতঃকালীন কলেজ, দিবা কলেজ এবং সান্ধ্য কলেজ সব দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কলেজ হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। একমাত্র অভিন্ন ঐতিহ্য এবং একই ভবনে অবস্থিত তিন কলেজের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছে। বাইরের লোকের কাছে এই তিন কলেজ যৌথভাবে Asutosh Group of Colleges বা আশুতোষ কলেজগুচ্ছ বলে পরিচিত।

কলেজের সহ-পাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপ

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাদর্শ দ্বারা আশুতোষ কলেজের সহ-পাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপ (co-curricular activities) গভীরভাবে প্রভাবিত।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে শ্যামাপ্রসাদ সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য দায়িত্ব হল পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তমুক্তিতে সহায়তা করা এবং সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে নানা দিক থেকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলা। কিন্তু এতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিঃশেষিত হয় না। স্কুল এবং কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে ছাত্রসম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনে ব্রতী হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। কি কি উপায়ে ছাত্র-সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করা যেতে পারে, এই বিষয়ে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। (ক) ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সামরিক শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলা। তাঁর মতে, ছাত্রদের চরিত্র-গঠনে এবং জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এইরূপ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। (খ) ছাত্রদের কল্যাণে নিয়োজিত

একটি স্বতন্ত্র দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা দরকার। এই দপ্তরের কাজ হবে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে ছাত্রদের শরীর-চর্চা এবং সুলভে বা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসাদির সুযোগ করে দেওয়া। (গ) প্রত্যেক কলেজে যাতে ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত এবং পরিচালিত ছাত্র-সংসদ থাকে সেই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া এবং প্রয়োজনীয় উৎসাহ এবং নির্দেশ দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব। তাঁর মতে, ছাত্ররা যদি তাদের প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের নিজস্ব সংসদ পরিচালনা করার অবাধ সুযোগ না পায়, তাহলে কোনদিনই ছাত্র-আন্দোলন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। (ঘ) অল্প খরচে ছাত্ররা যাতে থাকতে এবং খেতে পারে, তার জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। তিনি দুঃখ করে বলেন, অনেক জ্ঞান-বুভুক্ষু মেধাবী ছাত্রকে অবমাননাকর পরিস্থিতি মেনে নিয়ে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। (ঙ) শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একক চেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কিন্তু তরুণদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে বেকারির খানিকটা সুরাহা হতে পারে। কেবল মাত্র চাকরির পেছনে না ছুটে ব্যবসা-বাণিজ্য জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়ে তরুণদের উৎসাহ ও সুযোগ করে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-সমূহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং বোঝাপড়া থাকা বাঞ্ছনীয়।

আশুতোষ কলেজের কর্ণধার হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ উপরোক্ত শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী কলেজের সহ-পাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

১৯২৪ সালে বিজনী হাউসে থাকাকালীন একটি ঘরে ছেলেদের ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে এই ব্যায়ামাগার ১০ নম্বর বসন্ত বসু রোডে স্থানান্তরিত হয়। চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশক ব্যায়ামাগারের স্বর্ণযুগ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এখান-কার ছাত্ররা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় এবং একাধিকবার শরীর-চর্চার নানা ক্ষেত্রে National Championship অর্জন করতে সমর্থ হয়। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর এই ব্যায়ামাগারের নামকরণ করা হয় Shyama Prasad Gymnasium. কলকাতার বিভিন্ন ব্যায়ামাগারের মধ্যে এই ব্যায়ামাগার নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামাগার বলে গণ্য হত।

শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় এবং উৎসাহে কলেজ ১৯৫২ সালে ময়দানে নিজস্ব tent করবার অনুমতি লাভ করে। এই tent আশুতোষ কলেজ বঙ্গবাসী কলেজের সঙ্গে অংশীদাররূপে ভোগ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, কলকাতার অন্য কোন কলেজের ময়দানে নিজস্ব tent নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষের উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা থাকায় খেলাধুলার ক্ষেত্রে কলেজ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, নৌকা-বাইচ—এই চারটি ক্ষেত্রে আশুতোষ কলেজ একাদিক্রমে কয়েক বৎসর শ্রেষ্ঠ টিম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাট দশকে আশুতোষ কলেজ প্রতি বৎসর আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় নানা রকম trophy জয় করতে পেরেছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজের মধ্যে আশুতোষ কলেজের রেকর্ড অনন্য বলা যেতে পারে।

ডক্টর মুখার্জির শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে কলেজ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি N.C.C. unit গড়ে তোলা হয় এবং নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়ে পরিপুষ্ট করা হয়। N.C.C.র বিভিন্ন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় কলেজের cadet রা সুনাম অর্জন করেছে। সকালের মেয়েদের জন্য একটা N.C.C. Girls Division ও ছিল।

১৯৩৩ সাল থেকে আশুতোষ কলেজে সেণ্ট জন্‌স্‌ এ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন নামে একটি এ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন ছিল। ময়দানে খেলার মাঠে এবং অন্যান্য সভা-সমিতিতে এদের duty দেবার জন্য ডাকা হত। এই ডিভিসনটি খুবই সক্রিয় ছিল এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে আশুতোষ কলেজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। কর্ম-শিবির (work camp) সংগঠন করে সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন কাজকর্মের সঙ্গে আশুতোষ কলেজ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে UNESCOর তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয় যাতে কলেজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি UNESCO Associated Youth Enterprise on Fundamental Education Work Camps-এর একটির সঙ্গে সামিল হয়। এই বিষয়ে আশুতোষ কলেজের Work camp unit-এর বহু বিবরণী UNESCO র সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে আশুতোষ কলেজ ক্লাশের চার দেয়ালের বাইরে শিক্ষার গণ্ডী সম্প্রসারিত করেছিল। ক্লাশের পঠন-পাঠনের মান উন্নত রাখার প্রতি কর্তৃপক্ষের যেমন সতর্ক দৃষ্টি ছিল, ঠিক একই প্রকার গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা ছাত্রদের চরিত্র-গঠনের প্রতি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাদর্শ অনুসারে কলেজের প্রথম যুগ থেকে শিক্ষার পাঠক্রমের অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত ছাত্র সংসদ গড়ে তোলা হয়। খেলাধূলো, নানারকম আমোদ-বিনোদন, সেমিনার, বিতর্ক সভা প্রভৃতি ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে উপরোক্ত কাজকর্ম ছাড়া ছাত্র সংসদ বৎসরে একটি কলেজ ম্যাগাজিন বের করে, ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পাঠ্যপুস্তক এবং খাতাপত্র সুলভ মূল্যে পায় তার জন্য একটি cheap stores পরিচালনা করে। কলেজ ক্যাণ্টিনও ছাত্র সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

মফঃস্বল থেকে যেসব ছাত্র কলেজে পড়তে আসে, তাদের থাকার জন্য শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় দুটি ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়। একটি ১৬ নম্বর বসন্ত বসু রোডে কলেজের নিজস্ব বাড়িতে। এই ছাত্রাবাসে মোট ৪৮ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। আরেকটি ২২ নম্বর কালীঘাট রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে। এখানে মোট ৪০ জন আবাসিকের ব্যবস্থা রয়েছে।

কলেজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে কলেজের ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া হল। প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর কলেজ আর পেছন ফিরে তাকায়নি। ভারতবর্ষের দু'জন সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলিষ্ঠ কর্মবীরের পরিচালনায় কলেজ ধাপে ধাপে দ্রুত এগিয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা কলেজের অগ্রগতিতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে।

কলেজের অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করার সময় একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রয়োজনীয় অর্থের সিংহভাগ কলেজ জুগিয়েছে নিজস্ব সঞ্চয় থেকে এবং দান সংগ্রহ করে।

চল্লিশ দশকের শেষ দিকে কলেজ বসন্ত বসু রোডে অনধিক ১০ কাঠা জমি ক্রয়

করে। তাছাড়া, ১৯৫২ সালে আশুতোষ কলেজগুচ্ছের অন্তর্গত তিনটি কলেজই যৌথভাবে কলেজ ভবনের পশ্চিমে ১ বিঘা ৮ কাঠা জমি ক্রয় করে। শেষোক্ত ভূমিখণ্ডটি যোগমায়া দেবী এবং শ্যামাপ্রসাদ কলেজকে ১৯৭৬ সালে দেয়া হয়েছে তাদের নিজস্ব বাড়ি তৈরী করার জন্য।

বসন্ত বসু রোডের ১০ কাঠা জমির উপর কলেজ দোতলা বাড়ি তৈরী করেছে। কলেজ লাইব্রেরীর সংগৃহীত বিশালসংখ্যক বইয়ের একটি অংশ নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বাড়িটি চার তলা করা হবে।

কলেজে এত বিভিন্ন রকম বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে যে এটাকে একটি ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ববিদ্যালয় বললে অতিশয়োক্তি করা হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন বে-সরকারী কলেজে রাশিবিজ্ঞান এবং ভূ-বিজ্ঞানে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা নেই। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজে কমপিউটর সায়েন্স পড়াবার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আশুতোষের নামাঙ্কিত কলেজের সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে বার বার এই কর্মবীরের সারস্বত সাধনার কথা মনে হয়। তাঁর সমকালীন অনেক প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মত অন্য কারুর মধ্যে একাধারে এত বিভিন্ন রকম গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে তাঁর কাজকর্ম এবং মনের সর্বোচ্চ সাধনার ও স্বপ্নের দিকটি তুলে ধরা প্রয়োজন। এইরূপ স্মৃতিচারণ নিঃসন্দেহে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রার পথ আলোকিত করবে।

উচ্চশিক্ষার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় মিশেছিল। ১৯২০ সালে অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আমার অধিকতর প্রিয় জিনিস কিছু নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হয়ে গবেষণামূলক কাজে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অঙ্কের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তিনি তাই হাইকোর্টে আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেন। কিন্তু আজীবন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে গিয়েছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার যে ব্যবস্থা দেখতে পাই এটা তাঁরই অবদান। যখন তিনি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন, তখন গুটি কয়েক অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। উপাচার্য হিসাবে যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক অধ্যাপক অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র একজন প্রগতিশীল প্রশাসক ছিলেন না। নানা কাজের মধ্যে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি অঙ্কশাস্ত্রে নানা রকম মৌলিক গবেষণা করেছেন। Forsyth নামক একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের differential equation-এর বইয়ে আশুতোষের উদ্ভাবিত differential equation সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্নের সমাধানের পদ্ধতি একটি পৃথক অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেশবিদেশের গুণীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। Dr. R. P. Paranjpye একজন বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। তিনি বলেছেন, আশুতোষ যদি আজীবন অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন,

তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে সারা বিশ্বের প্রথম সারির একজন গণিতজ্ঞ বলে গণ্য হতেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ্ ডক্টর সি, ভি, রমণ প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, বাঙ্‌লা আশুতোষের মধ্যে একজন তীক্ষ্ণ আইনজ্ঞ ও বিচারপতি এবং সুদক্ষ ও প্রগতিশীল উপাচার্যকে পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বের পণ্ডিতমহল আরও অনেক বড় একজন গণিতজ্ঞকে হারাল।

উচ্চ শিক্ষার মত আরেকটি বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। এটি হল পুস্তক সংগ্রহ করা। এই আসক্তি তিনি তাঁর পিতা ডক্টর গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ছেলের জন্য তখনকার দিনে ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের অঙ্ক-শাস্ত্রের বই ও জার্নাল কিনে দিয়েছিলেন। এই সংগ্রহকে কেন্দ্র করে আশুতোষ বিশাল ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তাঁর চার ছেলে—রমাপ্রসাদ, শ্যামা-প্রসাদ, উমাপ্রসাদ এবং বামাপ্রসাদ—জাতীয় গ্রন্থাগারে আশুতোষের সংগৃহীত বই দান করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে Asutosh Collection নাম দিয়ে একটি পৃথক বিভাগে এইসব পুস্তক রাখা হয়েছে। Asutosh Collection এ বইয়ের সংখ্যা চুরাশি হাজারেরও বেশি। আশুতোষ সংগ্রহে সব রকম বিষয়ের বই-ই আছে। প্রত্যেকটি বই তাঁর স্বাক্ষর, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য এবং কি মূল্যে বইটি সংগ্রহ করা হল ইত্যাদি তথ্য বহন করে। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের এত বিশাল সংগ্রহ আর কারও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে আছে কিনা সন্দেহ। তখনকার দিনে বই সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। য়ুরোপ এবং মার্কীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজে বই আনাতে যথেষ্ট সময় লাগত। তিনি য়ুরোপ এবং মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রকাশকদের কাছে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখতেন যাতে বই পেতে বিলম্ব না ঘটে।

আশুতোষ ১৯০৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণ করেন ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৯২০ সালে কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিচারকদের মধ্যে আশুতোষ নিঃসন্দেহে অন্যতম। বিচারকার্যে তিনি দুর্লভ পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আইন নিছক ব্যবসা নয়, ভোজবাজিও নয়। আইন হ'ল জীবন্ত বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইনের প্রয়োগ এবং ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

খুব অল্প বয়সেই আশুতোষ বিজ্ঞান-সাধনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের মাধ্যম হল বিজ্ঞান। কেবলমাত্র ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনের মাধ্যম নয়। বিজ্ঞানের অনুশীলন সব রকম কুসংস্কার এবং সনাতন প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে মনকে মুক্ত করে, সত্যকে জানতে এবং বুঝতে সাহায্য করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আশুতোষ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি।

পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ঐতিহ্যে যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীদের সতর্ক করে দিয়ে আশুতোষ বলেন, তাঁরা যেন পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ না করেন, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক যেন ছিন্ন না করেন। এক কথায়, যেন ঐতিহ্যগতভাবে ছিন্নমূল না হয়ে পড়েন। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ-ধাঁধান ঝলমলে আলোয় ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য ঐশ্বর্য যেন তাঁরা হেলায় উপেক্ষা না করেন। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির যেসব উপেক্ষণীয় বিষয় তা-ও যেন

বিসর্জন দেন। ১৯১৮ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বাছ-বিচার না করে সনাতন আদর্শের দোহাই দিয়ে প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সময় এবং শ্রম অপচয় না করা-ই বাঞ্ছনীয়। কালের গতিতে যা স্বাভাবিকভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে, তাকে বাদ দেওয়া ভাল। আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। সনাতন আদর্শের অনুকরণীয় বিষয়গুলি তুলে ধরতে হবে এবং তার আলোকে ভবিষ্যৎ গড়তে হবে।

আশুতোষ ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে মৌলিক চিন্তা জাতিকে উপহার দেন তার সপ্রশংস উল্লেখ করে বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এন্, কে, পাল্‌কিওয়ালা আশুতোষকে আধুনিক ভারতের "one of the great integrators" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, আশুতোষের দৃষ্টি সারা দেশে প্রসারিত ছিল, কোন ব্যাপারেই তিনি সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে জাতীয় সাহিত্যে (১৯২৪ সালে প্রকাশিত) আশুতোষের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "আজ এক বার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টিসংযোগ করিতে হইবে।"

বর্তমান কালে জাতীয় সংহতির সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। বহু ভাষা-ভাষী ভারতবর্ষে যে এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, এটা অনুমান করেই যেন আশুতোষ এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ বের করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই দিকে লক্ষ্য রেখে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ১৯৬৪ সালে আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে আয়োজিত সভায় বলেছিলেন "genius anticipates experience."

আশুতোষের মতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই সাহিত্যকে অভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকাশ বলে গণ্য করা সঙ্গত। এইসব সাহিত্যের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সাহিত্য পরিপুষ্ট হবে এবং প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়াবে। 'জাতীয় সাহিত্য' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে: "কলবাহিনী ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া একবার নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর স্রোতে মানস স্নান করিতে হইবে। শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্য্যবীর্য্যের সমাধিক্ষেত্রে রাজপুতানার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে, আমার বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজ-সজ্জায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষাবলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব,—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে।"

আশুতোষ বাস্তব জ্ঞান-বর্জিত স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন না। কি উপায়ে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যায়, তা-ও উনি নির্দেশ করেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের পাঠ্যসূচী এমনভাবে তৈরী করেছিলেন যাতে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই দুরূহ কাজ সফল করা সম্ভব বলে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ছিল। এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জাতীয় সাহিত্যে বলেছেন: "যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।" "আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন," সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ

এই মন্তব্য করেছেনঃ "তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ করেছিল।" স্বাধীনতা পাবার তিন চার দশকের মধ্যে আঞ্চলিকতা এমন বিশ্রীভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে ভারতবর্ষের সংহতি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার" কথা নূতন মাত্রা লাভ করেছে।

জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে ১৮৮৯ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট একটা চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে বি, এ, (পাশ কোর্স এবং অনার্স) এবং এম, এ পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে বাঙ্‌লা অথবা হিন্দী অথবা ওড়িয়া অথবা উর্দুতে একটি পত্র অন্তর্গত করা যায় কিনা এই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। ১৮৯১ সালের ১১ই জুলাই তারিখের Faculty of Arts এর সভায় তাঁর প্রস্তাব দাখিল করা হয়। যাঁরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, প্রস্তাবটি ১৭/১১ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। আশুতোষ হাল ছাড়েননি। পনেরো বৎসরের চেষ্টার ফলে তিনি মিন্টোকে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী করান। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে একটি ভারতীয় ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে সাম্মানিক ডি, লিট্ ডিগ্রী প্রদান করার সময় আশুতোষ বলেনঃ পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা গেল যে জাতীয় জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাঙ্গীকরণ ঘটাতে হলে ভারতীয় ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করতে হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় বাঙ্‌লা ভাষার যে পাঠ্যসূচী তিনি রচনা করেছিলেন, তা অভিনব। বঙ্গ সাহিত্য কি করে ভারত-সাহিত্যে পরিণত হতে পারে, তার আভাস এই পাঠ্যসূচীতে পাওয়া যায়। বাঙ্‌লা সাহিত্য নিয়ে এম্ এ পড়তে হলে ১২টি আধুনিক ভারতীয় ভাষার ভেতর থেকে দু'টি ভাষায় এবং পালি, প্রাকৃত এবং ফারসী এই তিনটি প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যে-কোন একটিতে পারদর্শিতা অর্জন করা আবশ্যিক ছিল।

ভারতীয় ভাষাকে তিনি জনগণের ভাষা বলে গণ্য করতেন। সুতরাং ভারতীয় ভাষার প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি জনগণের চিত্তাকাশ উন্মুক্ত করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক বহু জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার চেয়ে আশুতোষ অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিলেন। ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে দেশের লোকের সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাড়ীর সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্যঃ "If we do not thus bring ourselves into intimate touch with the progress of national life, we shall have a government of the many by the few instead of a government by all."

দুঃখের বিষয়, বর্তমান কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ-প্রবর্তিত আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে না। মনে হয়, এই কর্মবীরের উদার কল্পনাশক্তি এবং "ধ্যানের মহত্ত্ব" আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করতে

পারছি না। বর্তমান কালে জাতীয় সংহতির ভিত যখন নড়ে উঠেছে, তখন বোধহয় আবার আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যকে কি করে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় সাহিত্যে তিনি যে বিশাল কর্মকাণ্ডের রূপ তুলে ধরেছিলেন, তার তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। যে-স্বপ্ন চিত্রিত করেছেন আমাদেরও তার সামিল হতে হবে। "এখন এমন একটি সাধারণ সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে যাহার উপর দিয়া ভারতের সকল দেশের অধিবাসীরা তাহাদের সর্ববিধ বাধা-বিপত্তি পার হইয়া এক মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে। সকলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক হইবে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিবে না।"

তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজের পঁচাত্তর বৎসর পূর্তির প্রাক্কালে আশুতোষকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তাঁর পাণ্ডিত্য কর্মকুশলতা এবং উদার কল্পনাশক্তি শিক্ষা-জগতের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের অনুপ্রাণিত করুক, নূতন নূতন দিগন্ত উন্মোচন করতে উৎসাহিত করুক—এই কামনা করি।

আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা

কান্তি বিশ্বাস

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, শিল্প-সাহিত্যে ভারতবর্ষ এক সময়ে তাবৎ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—যার আকর্ষণে ছুটে এসেছিল—বিশ্বের জ্ঞান-পিপাসুর দল—তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার প্রেরণায়। আবার বিদেশী লোলুপ লুণ্ঠনকারীদের লোভাতুর দৃষ্টিও নিপতিত হয়েছিল—এই ভারতের উপর। আমরা সেই গরীয়সী, মহীয়সী, ঐশ্বর্য্যশালিনী ভারতের অধিবাসী।

দুই-শত বৎসর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাধীন থাকা সত্ত্বেও এই ভারত হারায়নি তার স্বকীয়তা—লুপ্ত হয়নি তার শাশ্বত বাণী। ক্ষুণ্ণ হয়নি তার শৌর্য্য বীর্য—ম্লান হয়নি তার স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য। ভারত আজও বিশ্বের বিস্ময়। আমাদের সাফল্য—আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের দেশ-প্রেম এবং ক্ষণিকের বিশ্বাস-ঘাতকতা—আমাদের জয়-পরাজয় নিশ্চয়ই আমাদের ইতিহাস। অন্ধ আবেগ নয়। হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছলতা নয়। বস্তুনিষ্ঠভাবেই আমাদের ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

বিশ্বের ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষ বাস করেন আমাদের ভারতবর্ষে। কিন্তু কী বেদনার কথা দুনিয়ার সমস্ত নিরক্ষর মানুষের প্রায় অর্ধেকই হচ্ছেন ভারতবাসী। তার থেকেও ক্ষোভের কথা—১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার দলিলে ভবিষ্যৎ-বাণী করা হল সরকারের পক্ষ থেকে—এক-বিংশ শতাব্দীর শুভ সূচনাতে পৃথিবীর মোট অক্ষরজ্ঞানশূন্য মানুষের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ থাকবে শুধু—এই ভারতে। কী লজ্জার কথা—সংবিধানে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও দেশের এক বিশাল অংশের শিশু আজও শিক্ষালয়ের অঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। একশ' জন শিশু যদি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়—তার মধ্যে মাত্র ত্রিশ জন অষ্টম শ্রেণীর সীমা অতিক্রম করতে পারে। সতের থেকে তেইশ বৎসর বয়স—উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাবে পড়ার বয়স। এশিয়া মহাদেশে এই বয়সের গড়ে শতকরা সতের জন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। আমাদের দেশে এই শতকরা হার মাত্র সাড়ে পাঁচ। ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গ। দেশের শিক্ষাচিত্রে এই রাজ্যের স্থান কিছুটা উজ্জ্বল হলেও ব্যতিক্রম নয়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে আশি বৎসরেরও পূর্বে শিক্ষা-আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই আবেগ-দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "দশটা কলেজ করুন না—আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক—মাট্রিক পাশ করেনি বাংলা দেশে এমন যেন কেউ না থাকে।" (স্যার আশুতোষ মুখার্জী ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সম্পাদককে বলেছিলেন)। সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ভারতে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও স্যার আশুতোষ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বৎসর পরেও আমরা তার থেকে কত দূরে! আমাদের এই ব্যর্থতা শোচনীয়। এই অমার্জনীয় দুর্বলতার কারণ খুঁজে বের করতে

হবে। শিক্ষা জগতের স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষিদের অমূল্য অবদান অধ্যয়ন করতে হবে। স্যার আশুতোষের জীবন-ইতিহাস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

স্যার আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে হলে—সেই যুগের বিদ্যমান অবস্থার নিরিখেই তা করতে হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে যেমন ধ্বংস করেছিল—তেমনি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল আমাদের স্ব-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি। সেখানেই সে ক্ষান্ত থাকে নি—এদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রমাণ এ্যাডামস্—এর রিপোর্টে পাওয়া যায়—তাকেও তারা বস্তুত নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পরে প্রশাসন চালানোর জন্য সস্তা দামে গোলাম পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি দলিল প্রকাশ করে—চার্লস উডস্ এর নাম অনুসারে এটিকে উডস্ ডেসপ্যাচ্ নামে অভিহিত করা হয়। এই দলিলটিই প্রকৃত পক্ষে ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচলনের ম্যাগনা কার্টা। এর তিন বৎসরের মধ্যেই ঘটে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা—প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি যাকে বিকৃত করতে চেয়েছিল। এই সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতে তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এক ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে স্থাপিত হতে থাকে কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৭ সালে দেশে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বালিকাদের জন্য এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেয়—ফলে স্ত্রী-শিক্ষারও প্রসার ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারক অভিযান যৌথ ভাবে দেশে ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। ১৮৮২ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে—আবার ঐ বৎসরই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সরকারের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য এক শক্তিশালী শিক্ষা কমিশনও গঠিত হয়— হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩) নামে যা পরিচিত। উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে প্রবর্তনের প্রধান প্রবক্তা ভারত পথিক রামমোহন রায় যে নব যুগের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের বলিষ্ঠ ভূমিকায় তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে নব জাগরণ বা রেনেসাঁস-এ উন্নীত হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে শিক্ষারও সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু বাংলায় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চেতনা এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় বৃটিশ সরকার কিছুটা শঙ্কিত হয়। সেজন্য ধুরন্ধর বৃটিশ শাসনকর্তা লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলাদেশকে ভেঙ্গে দুই টুকরো করে দেয়। শুধু বাংলা দেশ নয়—গোটা ভারতবর্ষ এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। বিশ্বকবির কণ্ঠে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। অবশেষে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়। স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দ বৃটিশের প্রবর্তন করা শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে এক পৃথক শিক্ষানীতি অনুসরণ করে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উদ্যোগী হন এবং ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদনুযায়ী গড়ে ওঠে। অন্য দিকে ঐ একই বৎসরে আশুতোষের বলিষ্ঠতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব বিধান প্রবর্তিত হয়। যার ফলে এর অধীনস্থ স্কুল কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

দুটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা যখন দেশে চলছে—একটি শাসক বৃটিশ পরিচালিত অপরটি দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত—সেই সময় ১৯১০ সালে মহামতি গোখেল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন করার জন্য বিল উত্থাপন করেন। পরে সরকারের আশ্বাস পেয়ে প্রত্যাহার করে নেন। কিছু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গোখেল ১৯১১ সালে পুনরায় বিল পেশ করেন। ১৯১১ সালে সরকারের বাধা দানের ফলে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

এই অস্থির অবস্থার মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যারাজি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নিযুক্ত হয় ১৯১৭ সালে স্যাডলার সাহেবের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন। স্যার আশুতোষ মুখার্জী এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যেই কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। লক্ষ্য করার বিষয় জোর স্বদেশী আন্দোলনে প্রকাশিত স্বদেশভূমিতে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন "গালামখানা" বলে মন্তব্য করেন—সেই সময় স্যার আশুতোষ পুনরায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্য নিযুক্ত হন।

স্যার আশুতোষ মুখার্জী ১৮৮৯ সালে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট—সদস্য রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ১৯২৪ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোন না কোন ভাবে যুক্ত থেকে স্বীয় প্রতিভার এক অনন্য সাধারণ নজীর রেখে গেছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাদ্-ভূমি হিসাবে এক সময় ছিল বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশ। স্কুল ছিল সাত শত এবং কলেজ ছিল ষাটটি। বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতায়। স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রশ্নে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। শিক্ষাজগতে স্যার আশুতোষের গুণ ছিল পরস্পর বিরোধী মতামতে অত্যন্ত বিতর্কিত এবং সেই সাথে ঘটনাবহুল। আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কে যত বিতর্কই থাকুক না কেন আজ সর্বজনীন ভাবে স্বীকৃত বর্তমানে পত্র-পুষ্পে সুশোভিত শিক্ষার যে প্রস্ফুটিত শতদল আমরা দেখতে পাচ্ছি তার পিছনে আশুতোষের অবদান ছিল অসামান্য।

মনীষী আশুতোষ যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত এই পরাধীন দেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তিনি এটাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন বৃটিশ এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তার স্বার্থে যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন—ততটুকুই সে দিতে প্রস্তুত। গোখেলের শিক্ষাবিলের পরিণতি আশুতোষের এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করে দেয়। সেইজন্যই তিনি বলেছিলেন—"যে দেশে সাধারণ শিক্ষা কিছুতেই সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না—সেদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে?" আশুতোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল—তিনি উচ্চ শিক্ষাঘেঁষা—তাঁর এই কথাই তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদকে খণ্ডন করতে যথেষ্ট।

পরাধীন ভারতে বসবাস করে আশুতোষের মত তেজস্বী নেতৃত্বকেও অনেক কথা মন খুলে বলার বাসনাকে সংযত করতে হয়েছে। তাঁর এই বেদনার কথা তাঁর নিকট-জনদের নিকট অনেক সময়ে অকপটে প্রকাশও করেছেন। সেজন্য আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তার অনেক সময় অপব্যাখ্যা হয়েছে। দেশবাসীর নিরক্ষরতার অভিশাপ তাঁকে নিদারুণ ভাবে ব্যথিত করলেও—তাকে দূরীভূত করতে তাঁকে অগ্রগামী হতে হয়েছে।

বৃটিশ রাজত্বের বাইরে মহীশূর রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে ১৯-১০-১৯১৮ তারিখে মন খুলে তিনি বলেছিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হোক—প্রগতির পথে তাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। তা থেকেই জনশিক্ষার অনুকূল সুযোগ সুবিধার পথ প্রশস্ত হবে। শিক্ষা ঠিক জলাধারের মতো ; ভূমিকে উর্বরা ও ফলবতী করতে তাকে নিচে নামতেই হবে। কেবলমাত্র ভিত্তিমূলে জলস্রোত বইয়ে দিলে তা জলমগ্ন হবে, জলবদ্ধ হয়ে সব বিনাশ করবে। শীর্ষদেশে জল সিঞ্চন করলে তা নীরবে ক্রমাগত নিষিক্ত করতে করতে নিচে নামবে। ফলে প্রতিটি অঙ্কুর-উদ্গম হবে—প্রতিটি বীজমূলকে তা আহার যোগাবে—শীর্ষ দেশ থেকে মূলদেশ পর্যন্ত মুকুলিত করবে। বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হোক। কর আদায়ের যে উচ্চ দেউড়ি জ্ঞানালোকের পথ অবরোধ করছে তা উৎপাটিত হোক।"

আশুতোষ সঠিত ভাবেই বুঝেছিলেন—বিদ্যালয় এবং কলেজগুলির পঠন-পাঠনের মানকে উন্নত করতে হবে। শিক্ষালয়ের যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে তাকে এতটুকু অপচয় করা চলবে না। জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিরোধ নয়—বরং বোঝাপড়ার সহ-যোগিতা। নেতৃবৃন্দ যখন বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে জাগ্রত এবং সংগঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ--তিনি তখন বৃটিশের নিকট থেকে আদায় করা সুযোগটুকুকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে শিক্ষার পরিস্থিতিকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সেজন্য স্কুল এবং কলেজগুলিকে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হন। অনেকে বাধা দিয়েছেন—বিশেষ করে কলেজের অধ্যক্ষগণ প্রবলভাবে এই উদ্যোগের প্রতিবাদ করে-ছিলেন। আশুতোষ বলতেন—"মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরস আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, তেমনি স্কুল-কলেজগুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন ভাবে গড়ে না ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষবিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া হয় তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে?" স্কুল-কলেজগুলিকে মূলতঃ চরম ভাবে উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় উৎকৃষ্ট মানের (centre of excellence) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) তে যখন ওকালতি করা হয়—তখন মনে হয় আশুতোষের বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা-চিন্তার প্রতি কী নিদারুণ অবহেলা এখনও করা হচ্ছে।

আশুতোষ মাতৃভাষার প্রতি ছিলেন প্রকৃত শ্রদ্ধাবান। ১৮৯১ সাল থেকেই তিনি চেষ্টা করতে থাকেন কি উপায়ে এন্ট্রান্স থেকে এম, এ, পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষায় একটি পরীক্ষা হয়। বারে বারে ব্যর্থ হয়েছেন—কিন্তু ভগ্নোদ্যম হয় নি। অবশেষে তিনি সফলকাম হন।

১৯০৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্যের ভাষণে ছাত্রদের তিনি বলেছিলেন—"তোমরা তোমাদের মাতৃভাষা অনুসরণ করবে। কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার যে মহামূল্য সম্পদ তোমরা আহরণ করেছ, তোমাদের দেশবাসীর কাছে তা পৌঁছে দেবার ইহাই এক মাত্র উপায়।" তিনি একবার বিদেশী ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"দশভূজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়। গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য—ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।" সেই জন্যই তাঁকে বাঙ্গালী জাতির সারস্বত যজ্ঞের সর্ব প্রধান ঋত্বিক বলা হয়।

স্বাধীনতার এত দিন পরেও ইংরাজী মাধ্যমের শিক্ষার প্রতি সমাজের একটি অংশের একটি যুক্তিহীন অন্ধ মোহ যখন দেখি—তখন মনে হয় এদের নিকট আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা কী শোচনীয় ভাবে লঙ্ঘিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের প্রতি আশুতোষের ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস। যতদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন—কোন বাইরের হস্তক্ষেপ তিনি মেনে নেন নি। লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে তিনি তা করে ছাড়েন। আশুতোষ তখন সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন—এই সময়ে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা বৃটিশ সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। স্বাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন "গজেন্দ্র গাদকার" কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। তাদের সুপারিশ কার্যতঃ বাতিল করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বেপরোয়া হস্তক্ষেপ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং নয়া শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন পর্যন্ত এই দৃষ্টি ভঙ্গিরই শিকার হয়ে ছিল—সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে স্যার আশুতোষ যে সংগ্রাম করেছিলেন এখনও তা পরিচালন করতে হচ্ছে—দুর্ভাগ্যের হলেও এটাই সত্য।

একটি অভিযোগ ছিল—আশুতোষের আমলে ব্যাপক ভাবে ছাত্রদের পাশের হার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৮ই জানুয়ারী ১৮৯০ যে ভাষণ দেন সেখানে বলেন "per centage of failure of our examinations roughly speaking ranges between 40 to 60—near that of London University so long but in the last year's Arts examination it rose to 70% at the Entrance examination and it was high at all the examinations—it should prevent wastage....' এই অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের জন্য আশুতোষ কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষায় কঠিন প্রশ্ন করায় তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলতেন "ছাত্র হইয়া ছাত্রদের পরীক্ষক হইতে হয়।" প্রশ্নের খসড়া তৈরী করে আশুতোষকে দেখাতে হত। তিনি প্রশ্নকারীকে বলতেন—'মহাশয়, এটি স্মরণে রাখিবেন, প্রশ্নের দ্বারা আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় আমরা মাপ করিব না। আপনি যত বড় বিদ্বান—তাহা ক্ষুদ্র বালকদিগকে বুঝাইয়া আশ্চর্যান্বিত করিতে যাইবেন না—এটি সর্বদা স্মরণে রাখিবেন যে শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হইবে সেই সেই শ্রেণীর বালকদিগের নিকট আপনারা যাহা ন্যায়তঃ প্রত্যাশা করিতে পারেন সেই পরিমাণ বিদ্যা তাহাদের আছে কি না—তাহাই দ্রষ্টব্য—অতিরিক্ত কোনো জটিল সমস্যার দ্বারা পরীক্ষাগৃহে তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া দিবেন না।" ১৯১০ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা উঠে গিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। তিনি নিজে অঙ্ক এবং ইংরাজী প্রশ্নের অন্যতম প্রশ্নকর্তা ছিলেন। তিনি বলতেন "প্রশ্ন করা উচিত Average ছাত্রদের জন্য।" আশুতোষের পূর্বে পরীক্ষায় রচনা ব্যতীত কোন বিকল্প প্রশ্ন

থাকত না—আশুতোষই বিকল্প প্রশ্নের প্রবর্তন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—"যদি ভাল লেখা হয়—পুরো নম্বর দেবেন না কেন?" শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ বাংলার সে নেতৃত্ব—স্যার আশুতোষ না থাকলে—তা আদৌ সম্ভব হত না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব বিদ্যার আলয় করে গড়ে তুলেছিলেন। ছাত্রবৎসল আশুতোষের হৃদয়ের এক বিরাট অংশ জুড়েছিল ছাত্রদের প্রতি দরদ। তাঁর জীবনে এই ছাত্রদরদের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। আজ প্রায় প্রত্যেকটি পরীক্ষায় সংগত ভাবেই অভিযোগ ওঠে—প্রশ্নের ধরণ, চরিত্র, ভাষা নিয়ে। অভিযোগ ওঠে পরীক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে জানি না এই সকল কর্তা ব্যক্তিরা আশুতোষের উত্তরসূরী হতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল—"কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে। একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অনেক অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োজন..... শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মবিকাশ লাভ করা, হৃদয়ের মার্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা" (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে দশম বার্ষিকী-ভাষণ)।

গবেষণার প্রতি আশুতোষের দৃষ্টি ছিল প্রখর। এশিয়াটিক সোসাইটির দায়িত্ব-প্রাপ্ত হয়ে গবেষণার সুযোগকে তিনি প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি করেন। এখানে কল্পনা, পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ তিনি একই সাথে করতেন। শিক্ষা-নায়ক, শিক্ষা সংস্কারক, শিক্ষা-সংগঠক আশুতোষ ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তিনি বলেছিলেন—"এখন ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষার কোনো বিশিষ্ট পথ নাই—যাহা আছে তাহা সমস্তই লুপ লাইনের মত বাঁকা পথ।" এই প্রেক্ষাপট থেকেই তিনি শিক্ষা জগতকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন।

আজকের ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নে আশুতোষের কর্মধারা, চিন্তাশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরাধীন ভারতে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতবাসী-বঙ্গবাসীকে যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে গেছেন—আজ শিক্ষার সাথে যুক্ত প্রত্যেক মানুষের তা শুধু স্মরণ করা নয়—অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আইনবিদ্ আশুতোষ

ডঃ অমিত সেন

'প্রতিভা এমনি জিনিস যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে সজীব করিয়া তোলে'। স্যার আশুতোষ সম্পর্কে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিভাবানরা তাঁদের মনস্বিতার মহিমায় বিশ্বজগতকে সুন্দর ও সুভাষিত করেন। তাঁরা অন্ধকার থেকে আলোকে, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখান। সেই পথ ধরে সঠিকভাবে, চলতে পারলেই দেশের ও দশের সামগ্রিক উন্নতির পথ সুগম হয় ; এর থেকে বিচ্যুতি ঘটলে হয় অবক্ষয় ও সর্বনাশ—সততা, নিষ্ঠা ও আদর্শ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে মুছে যায় ধীরে ধীরে।

স্যার আশুতোষ তথাকথিত অর্থে মহাপুরুষ ছিলেন না, ছিলেন মহৎ প্রতিভার অধিকারী এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাই এমন এক মহৎ ব্যক্তিকে স্মরণ করলে মহত্বের প্রতিই সম্মান দেখানো হয়, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই স্বল্প পরিসরে এই ব্যক্তিটির কর্মজীবনের কৃতিত্বের ও দক্ষতার সবদিক তুলে ধরা অসম্ভব, তাই এই নিবন্ধে কেবল আইনবিদ্ হিসাবে আশুতোষ যে দৃঢ়তা, মননশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, সততা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেইগুলিই তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা থাকবে।

পরিচয়

স্যার আশুতোষ Tagore Law lectures এ উপস্থিত থেকে পর পর তিন বছর ঐ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জ্ঞান ও দক্ষতা দেখিয়ে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি আইন পাশ করেন (বি. এল) এবং আইন ব্যবসায় যোগদানের জন্য 'উকিল' (Vakil) হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন। সুপ্রসিদ্ধ আইন বিশারদ স্যার রাসবিহারী ঘোষের কার্যালয়ে আইন শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় লিপ্ত থেকেও আইন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনোর আগ্রহ ও অনুরাগ তাঁর প্রবল ছিল। ১৮৯৪ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের সর্বোচ্চ এল. এল. ডি, (L. L. D.) ডিগ্রী পান। ১৮৯৮ সালে Tagore Law Professor নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে স্যার আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। দীর্ঘ কুড়িবছর তিনি বিচারপতি ছিলেন। ১৯২৪ সালের ৫ই জুন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

আইবিদ্ স্যার আশুতোষ

একথা স্বীকার করতেই হবে যে স্যার আশুতোষ যদি গণিতশাস্ত্র নিয়ে অধ্যাপনা করতেন, তবে তিনি একজন অতি সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিসেবে তাঁর পরিচয় ইতিহাসের পাতায় লিপবদ্ধ করে যেতে পারতেন। কিন্তু নিতান্তই এক অনাড়ম্বর

ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি আইন ব্যবসায় যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন সুদক্ষ আইনজীবী সম্মানিত বিচারপতি ও বিশিষ্ট আইনবিদ্ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে তিনি গণিতশাস্ত্র শিক্ষালাভে যে উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন তা বিফলে যায়নি। কারণ আইনশাস্ত্রের খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম আইনের বিশ্লেষণ করতে হলে গণিতশাস্ত্রে পূর্ণ দখল থাকার বিশেষ প্রয়োজন। বুদ্ধিমত্তা, স্পষ্টবাদিতা, যুক্তিসম্মত মৌলিক মানসিক শক্তির বিকাশের জন্য গণিতশাস্ত্রে ও আইন-শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অপরিহার্য্য। আইনশাস্ত্রে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের ও দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন, তাঁরা অনেকেই মেধাবী ও সুদক্ষ ছিলেন গণিতশাস্ত্রে। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন—Chief Baron Pollock, Baron Alderson, Mr. Justice Maule, Lord Manners, Lord Lyndhurst, Lord Langdale এবং Chief Justice Tyndal.

স্যার আশুতোষ উকিল ও বিচারপতি এই দুইক্ষেত্রেই তাঁর কর্মদক্ষতা ও মেধার পরিচয় সমভাবে রেখে গেছেন। Law of Perpetuities-এর উপর তিনি যে Tagore Law lectures দিয়েছিলেন, তা আজও একটি উচ্চমানের রচনা হিসেবে আইন জগতে সমাদৃত হয়ে থাকে। তিনি বিচারপতি থাকাকালীন আড়াই হাজারেরও বেশী মামলায় রায় দিয়েছেন। সেই রায়গুলি ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিখুঁত ও ত্রুটিবিহীন। এক কথায় বলা চলে প্রায় প্রতিটিই ছিল master piece Judgment. তাঁর এই বিশদ বিবরণপূর্ণ ও সুদীর্ঘ রায় সম্পর্কে তাঁরই সমকালীন বিচারপতি রামপিনী বলেছিলেন যে অতিশীঘ্রই বিচারপতি আশুতোষ অনুভব করতে পারবেন যে দীর্ঘ রায় প্রতিটি মামলায় দেওয়া অসম্ভব। বিচারপতি রামপিনীর এই ভবিষ্যৎবাণী বিচারপতি আশুতোষ ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন। পাঠকবর্গের কাছে এ কথা অজানা নেই যে বিচারপতি আশুতোষের প্রতিটি মামলার রায়ই ছিল সুদীর্ঘ, সম্পূর্ণ, স্পষ্ট, ত্রুটিহীন এবং আইনে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। স্যার আশুতোষের ব্যবহার ছিল অমায়িক ও দ্রুত উপলব্ধির ক্ষমতা ছিল উল্কাবৎ। বিচারপতির আসন অলংকৃত করার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বিচারপতি হিসেবে। এমন কি তাঁকে, "স্যার জর্জ জ্যাসেল্‌স" বলেও অভিহিত করা হত।

সুপ্রসিদ্ধ আইনবিদ্ স্যার বার্নস্ পিকক্ বিচারপতি আশুতোষ সম্পর্কে বলে-ছিলেন যে—

> "There has been no judge like him within a century at least. There have been judges more learned, judges more subtle judges more elent but none who possessed his rare combination of clearness, vigour of understanding, varied knowledge, swiftness of apprehension and mastery of legal principles. He had always the faculty of hitting the right nail on the head".

নিজ কর্মক্ষমতার উপর অসীম আত্মবিশ্বাস ছিল বিচারপতি আশুতোষের, আর ছিল কাজ করার সীমাহীন উৎসাহ ও ক্ষমতা। আইনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম কলাকৌশল প্রয়োগে তিনি এতো দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে তিনি কখনও নিজেকে আইনের ক্রীতদাসে পরিণত হতে দেননি। এর দৃষ্টান্ত তিনি *Muhamed Akbar Zaman Khan*

Vs. Sukhdeo Pande—এ মামলায় রেখে গেছেন। এই মামলায় বিবাদীপক্ষ যদিও Code of Civil Procedure-এর Order 21 rule 29 যথাযথভাবে মেনে চলতে পারেনি, তথাপি তিনি বিবাদীপক্ষকে দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ—

> "The question, however, arises, what are the functions and powers of the Court, when a party litigant has found it impossible to comply with the requirements of the statute, not because of his own fault, but by reason of the action or inaction of the court. In our opinion, the principle applicable to such a contingency is expressed by the maxim, *actus curice reminem gravabit* (an act of the court shall prejudice no man)".

বিচারপতি আশুতোষ মনে করতেন যে প্রতিটি বিচারপতির প্রধানতঃ দুটি কর্তব্য পালন করা উচিত। এক, তিনি আইন প্রণয়ন বা রচনা বিচক্ষণতার সঙ্গে করবেন, যদিও আইন তৈয়ারী বিচারপতির আওতায় পড়ে না। দুই, আইনের প্রয়োগ তিনি দক্ষতার সঙ্গে করবেন। এই কর্তব্য দুটি সামনে রেখে তিনি প্রতিটি মামলার রায় দিয়েছেন। *Nandalal Agrani Vs. Jogendra Chandra Dutta* মামলায় রায় দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'Fiction has no place where substantial justice does not require its interference, still less where substantial justice would suffer from its operation. The court would not endure that a mere form or fiction of law introduced for the sake of justice should work a wrong, contrary to the real truth and substance of the thing".

হিন্দু আইন সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি আশুতোষ যে সব রায় দিয়েছেন সেইগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তিনি রায় দান করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর কত গভীরে চলে যেতেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক উৎস থেকে উদ্ধৃত করে অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে স্পষ্ট ও ত্রুটিহীন রায় দান করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ সব মামলায় সঠিক ও নির্ভুল রায় দিতে হলে Hindu Court of Justice যে পদ্ধতি অনুসরণ করতো সেই পথই এখানেও অনুসরণ করা উচিত। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন—

> "We may here refer to some weighty observations made by Lord Gifford on the mode of the determination of questions of this character by our tribunals; this being a question purely of Hindu Law great care must be taken in coming to a decision upon that subject, in order to prevent the judgement of English judges from being warped by impressions made upon their minds in consequence of their habitual application of English Law and the nature of English decision to which they are accustomed, and to consider in what way Hindu Court of Justice would have decided the point".

Khub Lall Vs. Ajodhya মামলায় যে প্রশ্নটি বিচারের জন্য আদালতে এসেছিল সেটি হল যে কোন হিন্দু বিধবার একটি পুকুর খনন ও পবিত্র কাজে উৎসর্গ করার জন্য কোন সম্পত্তি স্থায়ীভাবে লিজ দিয়ে টাকা ধার করার আইনসঙ্গত অধিকার আছে কিনা। এই আইনসংক্রান্ত প্রশ্নটির মীমাংসা করতে গিয়ে বিচারপতি আশুতোষ Raghunandan-এর Jalashaosargatattwa এবং Chaturbarga Chintamoni-এর Himadri মূল উৎস থেকে উদ্ধৃত করে রায়ে বলেছিলেন যে এসব ক্ষেত্রে Hindu Court of Justice যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতো এখানেও সুবিচার করতে হলে আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলা উচিত। *Debi Bhagat Vs. Golab Bhagat* মামলায় বিচারপতি আশুতোষ প্রথিতযশা ও সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু আইন বিশারদ স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীর মতামত বা হিন্দু আইনের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ না করে তাঁর বিপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্য একটি মামলায় (Rangaswami Vs. Nachiappa) যখন একই প্রশ্ন উত্থাপন করে তার মীমাংসার জন্য Judicial Committee of Privy Council-এ (সর্ব উচ্চ আদালত তখনকার সময়ে) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন Lord Dunedin এই মামলায় রায় দিতে গিয়ে Debi Bhagat মামলার রায় উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছিলেন

> "that their lordships wish to acknowledge how much they have been assisted by the lucid and able judgments Jenkins C. J. and Mookherjee J. in that case which though expressed in terms not identical, are in substance the same.....but viewed in its true light and character it was one of a class of decisions which acquire a weight and effect much beyond that which can be attached to the relative position of the court from which they proceed".

বিচারপতি আশুতোষের সক্রিয় অংশগ্রহণে যে আইনটির সবচেয়ে বেশী উন্নতি সাধন সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল সেটি হ'ল Law of Mortgage. The doctrine of Substituted Security-র যে সরল ও প্রাণবন্ত ব্যাখ্যা তিনি *Hakimlal Vs. Ramlal* মামলায় দিয়েছিলেন তা সত্যিই তাঁর আইনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পান্ডিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে আরো দুটি মামলায় যথা *Surjiram Marwari Vs. Barhamdeo* ও *Gurudeo Singh Vs. Chandrika Singh*) the doctorine of Subrogation-র যে সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করেছিলেন তা আইনের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই রায়দানের ফলে বিচারপতি আশুতোষকে সম্মানের সাথে বলা হত *Sovigny of Subrogation*.

শুধু দেওয়ানী মামলাতেই নয়, ফৌজদারী মামলায়ও বিচারপতি আশুতোষ তাঁর দক্ষতা, পারদর্শিতা ও সুবিচারের নজির রেখে গেছেন। তাঁর আইনের চোখে সকলেই ছিল সমান। অহেতুক কারো অনুকূলে তিনি কোন রায় দেননি বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। আইনের তুলাদন্ড সঠিকভাবে ধরে রেখেছিলেন। এই কারণেই তিনি সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। *Pulin Behari Dass Vs. The King Emperor* মামলাটির রায় আইনের ইতিহাসে একটি নজির সৃষ্টি করেছে। তিনি রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

"Criminal courts, no less than Civil courts exist for the administration of justice and courts of both descriptions have inherent power to mould the procedure, subject to the statutory provisions applicable to the matter in hand, to enable them to discharge their functions as courts of justice".

কিন্তু শেষের দিকে বিচারপতি আশুতোষের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় বিশেষ করে *Rex Vs. Barendra Kumar Ghosh*-র মামলার দীর্ঘশুনানী এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রায়দান করতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বিচারপতির দায়িত্ব আরো বহুদিন পালন করতে হলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঠেকানো সম্ভব হবে না। তাই তিনি ১৯২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় বিচারপতির আসন থেকে বিদায় নেন। বিচারপতি আশুতোষের কর্মজীবনের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো তিনি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, যে দক্ষতা, যে নিষ্ঠা, যে সততা, যে আদর্শ ও জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন, সেই সবগুলিই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেশবাসীর হৃদয়ে এক স্থায়ী আসন চিরকালের জন্য রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তারা আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

বিচারপতির আসন থেকে অবসর গ্রহণের দিন স্যার ল্যাঁসলট্ স্যাণ্ডারসন প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

"His great knowledge, his wonderful memory and his untiring energy have been devoted to this purpose for nearly twenty years, and his service in this respect will always be remembered and will constitute a record of which any man is entitled to be proud. He has been an outstanding personality not only in the court but also in Bengal, and I think I may say with propriety that his name has been known and his influence felt the whole of India".

অবসর মানে চিরকালের জন্য ইহলোক থেকে বিদায় নয়, তাই আশা ছিল অবসর গ্রহণের পরও বিচারপতি আশুতোষের কাছ থেকে নানাভাবে দেশবাসী উপকৃত হতে পারবে। কিন্তু অবসর গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে দেশবাসীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে হল।

স্যার আশুতোষ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তাঁর মৃত্যুতে আইনের জগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেই শূন্যতা আর কোনদিনও পূরণ করা সম্ভব হবে না। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি স্যাণ্ডারসন্ বলেছিলেন—

"There is no doubt that his death, as far as our human limitations enable us to judge, is a great calamity. I think that no one will deny that Sir Asutosh stood prominent among his fellow countrymen. He was the greatest Bengalee of his

generation. I do not think I should be wrong if I were to say that in many respects he was the greatest Indian of his day".

স্যার আশুতোষের সততা, নিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শ বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। আইনের জগতে তিনি একজন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজকাল চারিদিকে যে অবক্ষয় চলছে সর্বস্তরে, আইনের জগতেও তার ব্যতিক্রম নয়, স্যার আশুতোষের, বিশেষ করে তাঁর আইনজীবী জীবনের, পর্যালোচনা করতে গিয়ে মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যে এই ধরনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ আদৌ আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, এই চরিত্রটি কাল্পনিক। যদি জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আমরা কেন তাঁর সততা ও আদর্শের পথ ধরে চলতে পারছি না। আজ যদি তাঁর পথ অনুসরণ করতে পারতাম তা হলে হয়ত বলতে হতো না যে, "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

আশুতোষ ও বিজ্ঞান শিক্ষা

স্বপন কুমার দাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামটি উচ্চারণের সঙ্গেই এক তেজোদীপ্ত, মেধাবী এবং খাঁটি বঙ্গসন্তানের ছবি মনশ্চক্ষে ভাসে। একথা সত্য যে শুধুমাত্র গণিতজ্ঞ বা আইনজ্ঞ হলে তিনি বাংলার অন্যতম সুসন্তান রূপে গণ্য হতেন, কিন্তু বাংলা তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষাজগতে এক অনন্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে বিরাজ করতেন না। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা স্বাবলম্বী হবার সন্ধিক্ষণে এবং তার শৈশব ও কৈশোরে অভিভাবকত্বের গুরুদায়িত্ব এই দৃঢ়চেতা মানুষটি আমৃত্যু পালন করেছেন পরম নিষ্ঠায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে জাতীয় চেতনার উন্মেষকল্পে শিক্ষা সম্প্রসারণের সম্যক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গিয়েছিল। বহুযুগ পরাধীন থাকার ফলস্বরূপ আত্মবিস্মৃত হীনমন্য মানসিকতার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ-প্রভু (নেটিভ) ভারতবাসীকে ঠিক ততটুকু শিক্ষিত করতে আগ্রহী ছিল, যেটুকু হলে তাদের দেশশাসনের কাজে সুবিধা হবে কিন্তু ভারতবাসীর পরমুখাপেক্ষী মানসিকতার পরিবর্তন হবে না। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধকারদশা বিমোচনে সেই সময়ে যাঁরা এগিয়ে এলেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।

সরস্বতীর বরপুত্র আশুতোষের বাল্য ও কৈশোর কাটে অনুকূল পরিবেশে। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন ভবানীপুর অঞ্চলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। ছাত্র অবস্থায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা থেকে এম-বি, সবকটি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে তিনি বৃত্তি পান। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার চার্লস এই মেধাবী ছাত্রটিকে খুবই স্নেহ করতেন। এম-বি পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি গঙ্গা-প্রসাদের জন্য সরকারী চাকরির ব্যবস্থাও করেন। গঙ্গাপ্রসাদ অবশ্য স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্বাহ করতে মনস্থ করেন।

গঙ্গাপ্রসাদের অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল প্রবল, আগ্রহ ছিল বহুমুখী। কর্মব্যস্ত জীবনের অবসরটুকু কাটত গ্রন্থ-সান্নিধ্যে। চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থরাজির এক অনুপম ভাণ্ডার তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর ভবানীপুরস্থ বাসভবনে।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে স্যার আশুতোষের চার পুত্র—রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ এবং বামাপ্রসাদ তাঁদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বাহাত্তর হাজার বই এবং পত্র-পত্রিকা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দান করেন। গঙ্গাপ্রসাদ এবং আশুতোষের পুস্তক-প্রীতি বোঝাতে সংখ্যাটিই যথেষ্ট।

স্যার আশুতোষ তাঁর অসামান্য মেধা এবং অধ্যয়নস্পৃহার অনেকটাই পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করেন। অন্তর্মুখী মানসিক গঠনের বালক আশুতোষের সময় কাটত পাঠকক্ষে। সমবয়সীদের সঙ্গে গল্প-গুজব কিম্বা খেলাধুলার চেয়ে বইয়ের সঙ্গই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়।

আশুতোষের শিক্ষাজীবনের শুরু চক্রবেড়িয়া শিশু-বিদ্যালয়ে। ১৮৭৬ সালে (জন্ম—২৯ জুন, ১৮৬৪) প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শেষ করে তিনি সাউথ সাবার্বন স্কুলে (মেন) ভর্তি হন। ১৮৭৯ সালে ওই স্কুলের ছাত্র হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

সাউথ সার্বাবন স্কুলে পড়াশোনার সময়ে আশুতোষ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন। শ্রীশাস্ত্রী তখন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর একজন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক শ্রী মধুসূদন দাসকে তিনি পেয়েছিলেন গৃহশিক্ষক হিসাবে। সুপণ্ডিত সমাজসংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী এবং স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা মধুসূদন দাসের প্রভাব কিশোর আশুতোষের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। মাত্র একবার স্বল্পক্ষণের সাক্ষাতে তাঁকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন আর এক যুগনায়ক—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কলেজজীবনে আশুতোষ উচ্চশিক্ষার পাঠ নেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। পরে সিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতি উচ্চস্তরের মেধার অধিকারী আশুতোষ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ১৮৮১ সালে এফ-এ (ফার্স্ট আর্টস ; এখনকার উচ্চ-মাধ্যমিক) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। গণিতকে বিশেষ অধীত বিষয় নির্বাচন করে ১৮৮৪ সালে বি-এ এবং পরের বছর ১৮৮৫ সালে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এতেও তাঁর অধ্যয়নস্পৃহার নিবৃত্তি ঘটে নি ; ১৮৮৬ সালে তিনি আবার পদার্থবিজ্ঞানে এম-এ পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আশুতোষই প্রথম দুটি বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৮৮৬ সালেই আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করলেন। এবং পরের বছর আবার কলা ও সাহিত্যের তিনটি বিষয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষায় বসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট অবশ্য তাঁকে সেই অনুমতি দেন নি।

মেধাকে কোনোকালেই নিয়মের মধ্যে আনা যায় না। ১৮৮৮তে আশুতোষ শুধুমাত্র বি-এল পরীক্ষায় পাশই করলেন না, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে 'টেগোর গোল্ড মেডেল' লাভ করলেন। ছয় বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে গবেষণা-মূলক কাজের স্বীকৃতিতে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী লাভ করলেন।

বহুভাষাবিধ, শাস্ত্রজ্ঞ, বাগ্মী, আইনজ্ঞ, শিক্ষাগুরু—স্যার আশুতোষের বহুবিধ পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক অবিস্মরণীয় গণিত প্রতিভা। গণিতই ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। শোনা যায় স্কুলের ছাত্র আশুতোষ উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত জটিল গাণিতিক প্রশ্নাবলীর সমাধানে প্রায়শই মগ্ন থাকতেন। একটি প্রচলিত গল্পানুসারে একবার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ জেদী বালক আশুতোষকে কিঞ্চিৎ শাস্তিদানের অভিপ্রায়ে একটি ঘরে বন্দী করে রাখেন। বালকটি তার বন্দীদশা অতিবাহিত করে ঘরের দেওয়াল জুড়ে অঙ্ক কষে। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটিকে অতিরঞ্জিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ১৮৮৯ সালে এফ-এ শ্রেণীর ছাত্র আশুতোষের একটি গণিত-বিষয়ক প্রবন্ধ কেম্ব্রিজের 'মেসেঞ্জার অব্ ম্যাথামেটিক্স' প্রকাশিত হবার ঘটনাটিকে মনে রাখলে গল্পটি বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা যায়।

বস্তুত বি-এ পাশ করার আগেই তাঁর দ্বিতীয় এবং এম-এ পাশ করার আগে তৃতীয় আর পাশ করার অব্যবহিত পরেই চতুর্থ গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। তরুণ গণিতজ্ঞ আশুতোষকে চিনিয়ে দিতে এই চারটি গবেষণা প্রবন্ধই যথেষ্ট ছিল। গণিতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতি ইংরাজ বিদ্বৎসমাজকেও দিতে হয়েছে। আর একথা ভাবা খুব অযৌক্তিক হবে না যে ঔপনিবেশিক ইংরাজ সহজে নিজের জাত্যাভিমান বিসর্জন দিয়ে নেটিভ ভারতীয় প্রতিভার যোগ্য সম্মান দেয় নি। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এইচ জি রেনোল্ডস তাঁর সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষের মেধাকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকৃতি জানালেন—"The senior wrangler of the year, if I may borrow the phrase from Cambridge, is Asutosh Mookerjee of the Presidency College who stands first in the list of B.A. graduates and is in receipt of the Ishan and Vizianagram scholarships and of the Harish Chunder Prize", পরের দিকে উপাচার্য সি পি ইলবার্টও আশুতোষের গণিতে ব্যুৎপত্তির কথা উল্লেখ করেন।

গণিত তাঁর একান্ত প্রিয় বিষয় হলেও অন্যান্য বিষয়েও তাঁর আগ্রহ খুব কম ছিল না। বি-এ শ্রেণীতে গণিত ছাড়া তাঁর নির্বাচিত বিষয়গুলি ছিল ইংরাজী, সংস্কৃত এবং দর্শন। দ্বিতীয়বার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপের জন্য বিষয় নির্বাচনেও তাঁর সাহিত্য এবং দর্শনে অনুরাগ ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, নিজস্ব সংগ্রহশালার একাধিক সাহিত্য-দর্শন গ্রন্থে তাঁর মন্তব্যগুলিও একই নির্দেশ দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে গণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার সুযোগ ছল অত্যন্ত সীমিত। প্রেসিডেন্সী কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞানের কিছু নির্বাচিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। গবেষণার কথা চিন্তাই করা যেত না। অপর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কিছু যন্ত্রপাতি ছিল (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর গবেষণার কাজকর্ম এখানেই করেছিলেন)। একমাত্র ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কাল্টিভেশান অব সায়েন্স'-এই ছিল কিছু সীমিত সুযোগ।

গণিতে আজন্ম আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আশুতোষ গণিতচর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন করতে পারলেন না। গবেষণা বা অধ্যাপনার স্বপ্ন মুছে ফেলে তাঁকে চলে যেতে হল আইন ব্যবসায়ে। ১৮৮৭ সালে তখনকার শিক্ষাজগতের অধিকর্তা (ডাইরেক্টর অব দি পাবলিক ইন্সট্রাকশানস্) স্যার চার্লস ক্রফ্‌টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং জীবিকা হিসাবে আইনকে বেছে নিতে বাধ্য করে।

ক্রফ্‌ট সাহেব অনেকদিন থেকে মেধাবী ছাত্র আশুতোষের নাম শুনেছিলেন। সাক্ষাতে খুশী হয়ে ক্রফ্‌ট তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করতে চান। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তরুণটি তৎক্ষণাৎ ইংরাজ অধ্যাপকদের সমতুল্য বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চেয়ে বসেন। ক্রফ্‌ট একজন ভারতীয়ের কাছে এই ধরনের ঋজু ব্যবহার আশা করেন নি। তাঁর দাবী মেনে নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্নটি অত্যন্ত নম্রভাবে স্যার ক্রফ্‌টকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। সবিনয়ে এটাও জানিয়ে দিলেন, স্বাধীনভাবে আইনের ব্যবসা করাটাই তিনি শ্রেয় মনে করছেন। কুড়িবছর আগে পিতা গঙ্গাপ্রসাদও অনুরূপ অবস্থায় ইংরাজের

দাসত্ব করার চেয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আশুতোষ যশস্বী অধ্যাপক হতে পারতেন। অধ্যাপনার দিকে তাঁর আগ্রহও বড় কম ছিল না। অত্যন্ত উঁচুদরের গবেষকও হতে পারতেন। অবস্থার চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে আদালতের প্রাঙ্গণে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হল বটে, গণিতচর্চায় কিন্তু তখনই ছেদ পড়ল না। আরও পাঁচ বছর তিনি পুরোদমে সে চর্চা চালিয়ে গেলেন এবং ১৮৯২ সালেও 'এশিয়াটিক সোসাইটির' জার্নালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। গণিতের দুরূহ দুর্বোধ্য ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার কথা ১৮৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে উল্লেখ করেছেন উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

গবেষণাক্ষেত্রে আশুতোষের অবদান স্মরণ করেছেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ। তাঁর কথায়—"ভাস্করের পরবর্তীকালে তিনি হলেন প্রথম ভারতসন্তান যিনি গণিতের গবেষণাক্ষেত্রে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন যা মৌলিক বলেই মূল্যবান।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর গবেধণা পত্রগুলি 'মেসেঞ্জার অব ম্যাথামেটিক্স', 'দি কোয়ার্টারলি জার্নাল অব পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স' এবং 'দি জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'—এ প্রকাশিত হয়।

শুধুমাত্র এদেশের গণ্ডীতে নয়, গণিতজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি এবং সম্মান এসেছিল বিদেশ থেকেও। তরুণ আশুতোষকে যখন লণ্ডনের ম্যাথামেটিকাল সোসাইটি ফেলো নির্বাচিত করেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ। ততদিনে অবশ্য তিনি গণিতে এবং পদার্থ বিজ্ঞানে এম-এ ডিগ্রী পেয়েছেন এবং প্রথম চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সম্মান আসে ইউরোপ এবং আমেরিকার অগ্রগণ্য বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান থেকে। 'রয়্যাল সোসাইটি অব এডিনবার্গ' এবং 'রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি' তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে। এডিনবার্গ, প্যারিস এবং নিউইয়র্কের 'ম্যাথামেটিকাল সোসাইটি' আর 'রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমি' তাঁর নাম সম্মানিত-সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

এতগুলি বিদেশী খেতাব তাঁর দৈনন্দিন কাজ-কর্মে এবং শিক্ষাচিন্তায় পরিবর্তন আনল না। বরং ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী করল। শিক্ষাগুরু আশুতোষ বিজ্ঞান প্রসারে সক্রিয় ভূমিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীতে অন্তর্ভুক্ত সবকটি বই ছিল বিদেশীদের লেখা। তখনকার ছাত্রদের পক্ষে সেইসব বইয়ের মর্মোদ্ধার করা সহজ ছিল না। আশুতোষই প্রথম ভারতীয় যিনি এ কাজে অগ্রসর হলেন। ১৮৯৩ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানীর প্রকাশনায় তাঁর লেখা 'জিয়োমেট্রি অব কনিকস' (Geometry of Conics) বইটি বেরোয়। বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিশ্বর প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার' ভূয়সী প্রশংসা করে।

এদেশে বিজ্ঞান-চিন্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না। ১৯২২ সালের ১৮ মার্চ তাঁর দেওয়া সমাবর্তন ভাষণের অংশবিশেষ এই রকম—"বিজ্ঞানের সামান্য ছাত্র হিসাবে আমি তখনই (ছাত্রাবস্থায়) বুঝতে পেরেছিলাম সভ্যজগৎ বিজ্ঞানের কাছে কেন এত ঋণী। বিজ্ঞান বস্তুজগতে মানুষের জন্য নানা সুখ-সুবিধার বিধান করেছে বলে মানুষ তার কাছে বাধিত নিশ্চয়। মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য ঋণ এই কারণে যে বিজ্ঞান মানুষের চিন্তাকে মুক্তি দেয়—অন্ধকার থেকে তাকে আলোকের দিকে নিয়ে যায়। আমিও

স্থির বুঝেছিলাম যে বিজ্ঞান মনের শৃঙ্খল মোচন করে, অন্ধসংস্কারকে দূর ক'রে দিয়ে আসন রচনা করে যুক্তিবিচারের, মনোরাজ্যে স্বাধীনতার বাণী আনে বিজ্ঞান।"

বিজ্ঞান-চিন্তার প্রসারণ বস্তুত তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সদাব্যস্ত কর্ম-জীবনের অবকাশে তিনি বরাবর 'কাল্টিভেশান অব সায়েন্স'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে গেছেন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর গণিতের উপর একশো পঁচিশটি বক্তৃতা দেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠানের ঊনত্রিশতম বার্ষিক সম্মেলনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষের বক্তৃতামালা প্রসঙ্গে বলেন—"তাঁর বক্তৃতায় এম-এ শ্রেণীর ছাত্ররা যথার্থ উপকৃত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে বক্তৃতামালা বন্ধ করে দিতে হয়।"

১৮৭৭ সালে খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 'কাল্টিভেশান অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি অর্থাভাবে রক্তাল্পতায় ভুগেছে। ইংরাজ প্রভুরা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সুনজরে দেখে নি, একথা না বললেও চলে। আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কলিকাতার ধনীরাও কেউ এই প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেন নি। তাঁদের এই উদাসীন আচরণের পেছনে কোন মানসিকতা কাজ করেছিল, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। তবে তাঁদের সহযোগিতা এবং দাক্ষিণ্য পেলে হয়তো বা আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে পদার্থ বিজ্ঞানের এক তাত্ত্বিক গবেষককে পেতাম, যিনি শুধুমাত্র এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতেই সমর্থ ছিলেন না, তরুণ একদল বিজ্ঞানীও তৈরী করে যেতে পারতেন।

অথচ আর্থিক অনটন সত্ত্বেও 'কাল্টিভেশান অব সায়েন্স' সীমিত সামর্থ্য নিয়ে বহু বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিভার সন্ধান দিয়ে গেছে। নোবেল বিজয়ী সি ভি রমন তাঁর কাজ-কর্মের প্রাথমিক পর্যায় এই প্রতিষ্ঠানেই সম্পন্ন করেন।

আশুতোষের আর এক মহান কীর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' স্থাপন। ১৯১২ সালে আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) এবং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে দুটি সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রেসিডেন্সী এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল। না ছিল সেখানে উন্নত পরীক্ষাগার, না ছিল বিজ্ঞানের সব কটি শাখায় অধ্যাপনা করার মত উপযুক্ত শিক্ষক। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রেসিডেন্সী কলেজেও পদার্থ বিজ্ঞানের কয়েকটি নির্বাচিত শাখায় অধ্যাপনা চলত, গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি ছিল অবহেলিত। আশুতোষ মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ থাকা উচিত। তাঁর মতে গবেষণার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক এতই নিবিড় যে দুটিকে পরস্পর সম্পূরক এবং প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। গবেষণার সুযোগবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হবার অযোগ্য বলে মনে করতেন।

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে এবং মধ্যবর্তী সময়ে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ আর ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত দু দফায় বারো বছর আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের প্রতিনিধি-স্থানীয় বিদ্যাপীঠ করে তুলতে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিরলস পরিশ্রমের কথা এখন সর্বজনবিদিত এক ঐতিহাসিক সত্য। সে কাজে তিনি সফলও হয়েছিলেন। বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংলণ্ডের বাইরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন

করতে পেরেছিল। সুদূর পাঞ্জাব থেকে বর্মা, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আন্দামান দ্বীপমালা পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার অভিভাবক ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্ক এতই প্রগাঢ় ছিল যে অনেক সময়ে নামদুটি প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। লর্ড লিটনের ভাষায়—"In the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, he represented the university so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the university and the university Sir Asutosh".

১৯১২ সালে স্যার আশুতোষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল। সেই উপলক্ষে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্সী কলেজের সতীর্থ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে (আচার্য রায় বয়সে কিছু বড় ছিলেন, ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট তাঁর জন্ম) একটি চিঠি লেখেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন লন্ডনে, 'কংগ্রেস অব ইউনিভার্সিটিজ'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। চিঠির অংশবিশেষ এই রকম—"হয়তো আপনার মনে আছে যে, গত ২৪ ফেব্রুয়ারী যখন সিনেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদের প্রশ্নটি বিবেচিত হয়, তখন আপনি দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রফেসর পদ সৃষ্টির কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি। আমরা এখন বিজ্ঞানে দুটি প্রফেসর পদ অনুমোদন করেছি—একটি রসায়ন ও অন্যটি পদার্থবিদ্যার জন্য। আমরা অবিলম্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার সৃষ্টির জন্যও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।—আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে সর্বপ্রথম রসায়নের প্রফেসর পদে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন সি ভি রমন। লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং এস কে মিত্র (যিনি রেডিও ফিজিক্সে গবেষণা করে বিখ্যাত হন)।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গবেষণার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। রসায়নে তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর ছাত্রেরা—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশ্বের দরবারে সায়েন্স কলেজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পদার্থবিদ্যাতেও সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কে এস কে কৃষ্ণণের নাম বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত। বলাই বাহুল্য, এই কর্মযজ্ঞের প্রধান আহ্বায়কের নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা-প্রসারে তাঁর অবদানের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন উচ্চতর গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক সি ই কুলিস। তাঁর মতে—"The conversion of the university from a purely examining and inspecting body into a teaching institution would no doubt have been effected even without his efficient help but the addition of numerous schools of active research was almost entirely due to his effort".

সকলেই জানেন, আশুতোষ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যান নি। সায়েন্স কলেজে সেই আমলে যাঁরা নিজেদের বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশজনের শিক্ষাদীক্ষা এদেশে। প্রতিভার স্ফুরণ এই দেশের মাটিতে। সে যুগের দুই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উচ্চশিক্ষার পাঠ সমাপ্ত হয় বিদেশে। কিছু পরে পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অল্প সময় বিদেশে কাটান। অন্যান্যদের প্রতিভা আক্ষরিক অর্থেই দেশজ।

বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিদেশযাত্রা আশুতোষের খুব পছন্দসই ছিল না। প্রকৃত অর্থে মৌলিক গবেষণার সুযোগ বিদেশের গবেষণাগারে মেলে কিনা, সে বিষয়েও তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি জানতে পারেন, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিধারীকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাবার চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের কাছে ছদ্মনামে চিঠি লিখে তিনি ওই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, স্কলারশিপের টাকায় তিন বছর ইংলণ্ডে থেকে পড়াশোনা চালানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এদেশে গবেষণার সুযোগ এতই সীমিত যে উচ্চশিক্ষা শেষে প্রত্যাগত মেধাবী ছাত্রটির পক্ষে গবেষণা চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তিনি আরও প্রস্তাব দেন, যদি উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকার বাহাদুরের যথার্থ আগ্রহ থাকে তবে 'কাল্টিভেশান অব সায়েন্সকে' সাহায্য করতে পারেন।

একথা ভাবলে ভুল হবে, আশুতোষ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। অনুসরণে তাঁর আপত্তি ছিল না, অন্ধ অনুকরণে আপত্তি ছিল। তাঁর সুস্পষ্ট রায় ছিল, উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিক্ষাধারাকে আমাদের দেশের প্রয়োজনভিত্তিক করে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার অনুকূলে তাঁর রায় ছিল। প্রসঙ্গত তাঁর ব্যবহৃত উপমাটি উল্লেখ করা যেতে পারে—"দশভুজার পাদপদ্মে রক্তজবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপূজার অযোগ্য।"

১৯০৪ সালে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' স্বীকৃতি লাভ করল। এতে স্থির হয় যে ভারতের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতাও মিলল। ১৯২২ সালের মধ্যে স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন কুড়িটি বিভাগে গবেষণামূলক কাজকর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটল। এর মধ্যে ছিল তাত্ত্বিক ও ফলিত গনিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং মনোবিদ্যার মত বিজ্ঞানের দশটি বিষয়।

১৯২২ সালের সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষ গর্বিত কণ্ঠে বলেন—"ভুলে গেলে চলবে না যে সম্ভবত কলা বিভাগের তুলনায় এই নবগঠিত বিজ্ঞান বিভাগই অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেছেন।....গণিতে, পদার্থবিদ্যায়, রসায়নে, উদ্ভিদবিদ্যায় এবং প্রাণিবিদ্যায় তাঁদের গবেষণার ফলাফল ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠগুলিতে আদৃত হয়েছে এবং সেসব জায়গায় বিজ্ঞান সমিতি ও বিজ্ঞান পত্রিকা কর্তৃক সাগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে।"

কলিকাতার অন্যতম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের' সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একাদক্রমে প্রায় পঁচিশ বছর তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং সহসভাপতি নির্বাচিত হন। প্রশাসনিক কাজকর্ম ছাড়াও নিয়মিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে দেন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০—এই তিন বছরে উচ্চতর গণিতের উপর বারোটি গবেষণা-প্রবন্ধ দিয়ে আশুতোষ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল সমৃদ্ধ করেন।

আশুতোষের বিশ্লেষণী বিজ্ঞানমনস্কতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে আর এক ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান—'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম'। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১৯০৫ সালের মে মাসে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের অছি-পরিষদে যোগ দেন।

১৯১০ সালে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ান বিল' কার্যকরী করার উদ্যোগে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এর ফলশ্রুতিতে মিউজিয়াম স্বাধীনভাবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক কাজকর্মের স্বাধীনতা পায়।

১৯১৩ সালের ২৮ নভেম্বর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে সভাপতির ভাষণে তিনি মিউজিয়ামের গুরুত্ব এবং কর্মপদ্ধতির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—"শুধুমাত্র প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট নিদর্শন সংগ্রহ এবং তার যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেই মিউজিয়ামের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, জাতীয় মিউজিয়ামে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি নিয়ে গবেষণা করার উপযুক্ত সুযোগ থাকা উচিৎ।" তাঁরই নেতৃত্বে মিউজিয়ামে শিল্পকলা, চিত্রশৈলী, প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের নতুন গ্যালারী তৈরী হয়।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মিলনমেলা 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশান' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন হল কলকাতায়, এসিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ১৯১৪ সালের ১৫ জানুয়ারী। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন আশুতোষ। সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন—".....নিছক লৌকিক বিনয়-বশত নয়, আমার সত্যই মনে হচ্ছে এই সভাস্থলে এমন অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা আজীবন একমনা হয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে এসেছেন, তাঁদের একজন যদি সভা-পতির আসন গ্রহণ করতেন তাহলে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত হত। তত্রাচ আমি আপনাদের নিশ্চিতি দিয়ে বলতে পারি যদিচ আমার অন্য অনেক ত্রুটি থাকেও, যে উদ্দেশ্যে আপনারা এই কংগ্রেস আহ্বান করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আমি কারো চাইতে কম ব্যাকুল নই।"

স্যার আশুতোষের আবিষ্কার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সি ভি রমন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একবার সখেদে বলেছিলেন—"Bengal in gaining a distinguished Judge and a great Vice-chancellor lost in him a still greater mathematician".

এক প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ হারাবার দুঃখ আমাদের সকলের থেকেই যাবে। সেই সঙ্গে এক পরম প্রাপ্তিযোগের কথাও না বললে নয়। বিজ্ঞান-চেতনার যে আলোকশিখা তিনি জ্বালিয়ে গেলেন আসমুদ্র হিমাচল ভারতে তা এখন বিজ্ঞানের মাঙ্গলিক যজ্ঞ-বেদীতে হোমাগ্নি হয়ে অনির্বাণ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

(১) অপরাজিত বসু ১৯৮৯ কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চা, পশ্চিমবঙ্গ ; কলকাতা বিশেষ সংখ্যা।

(২) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বঙ্গাব্দ ১৩৭১ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ; ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

(৩) জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ১৯৭২ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

(৪) দীনেশচন্দ্র সিংহ ১৯৮৯ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ; দেশ, ২৪ জুন।

(৫) রমাতোষ সরকার ১৮৮৯ কলকাতায় বিজ্ঞান গবেষণা ঃ সূচনা এবং কিছু উজ্জ্বল ঘটনা ; পশ্চিমবঙ্গ ; কলকাতা বিশেষ সংখ্যা।

(৬) শশধর সিংহ ১৯৭৫ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ; প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার।

1. A. P. Dasgupta 1973 Asutosh Mukherjee National Book Trust.

2. Gaurav Pande 1989 : Scientific Education in Calcutta ; Amrita Bazar Patrika, August, 20.

3. Narendra Krishna Singha 1966 Asutosh Mookerjee : a biographical study ; Asutosh Mookerjee Centenary Committee.

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশুতোষের শিক্ষানীতির প্রাসঙ্গিকতা

সুব্রত গুপ্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬৪ সাল) তখন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। তখন দেশের শিক্ষিত সমাজ বলতে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোককেই বোঝাত। সুতরাং দেশের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও তখন ছিল খুবই সীমিত। দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সম্পর্কে সার্বিক বিশ্লেষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পাইনি বটে, কিন্তু তার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই তৎকালীন চিন্তানায়কদের উৎকণ্ঠা,—কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোচন করা যায়, দারিদ্র্য দূর করা যায়, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়,—এই উৎকণ্ঠার ভাগীদার হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীকে আমরা দেখতে পাই, এবং তার শুরু হয়েছিল ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীর দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে শিক্ষার অভাবকে চিহ্নিত করেছিলেন। সাধারণ মানুষ যদি শিক্ষিত হত, তবে জমিদার, অভিজাত ও পুরোহিতগণ তাদের উপর অত্যাচার করার অথবা তাদের শোষণ করার সাহস পেত না। তাছাড়া তখনকার দিনে শিক্ষিত লোকের পক্ষে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করাও খুব কঠিন ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,—"জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজ সংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ত্রুটি কোথায়।....সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি— যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।....তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।" বিবেকানন্দ যে যুগে শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দিয়েছিলেন তখন শিক্ষিত লোকদের বেকার অবস্থা খুব তীব্র ছিল না। অবশ্য বিবেকানন্দ শিক্ষিত হয়েও তখনকার দিনে চাকরীর জন্য কিছুদিন দরজায় দরজায় ঘুরেছিলেন, কিন্তু তখন কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোর কর্মনিয়োগের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু গরীবদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটালে কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা তাদের কাছে উন্মুক্ত হত এবং শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, কাজের সুযোগ তাদের কাছে এসে যেত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ একই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সমসাময়িক এই দুই যুবকের জীবনধারা সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও একটি জায়গায় তাঁদের মিল দেখতে পাওয়া যায়। উভয়ই চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে,—শিক্ষার সুযোগ যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছয় সেজন্য উভয়েরই ছিল ঐকান্তিক আস্পৃহা। আশুতোষ ১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবার পর দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে বাংলার সর্বত্র শিক্ষার প্রসার করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেয়ে-

ছিলেন। দেশের যুবকদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেওয়াই ছিল আশুতোষের অনুসৃত শিক্ষা-নীতির মূল উদ্দেশ্য।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল আশুতোষ কর্তৃক অনুসৃত শিক্ষানীতির সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। আশুতোষ ছিলেন শিক্ষাবিদ এবং আইনশাস্ত্র বিশারদ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে তিনি হয়ত চিন্তা-ভাবনা করেছেন, কিন্তু তিনি যে এ-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নীতির প্রবক্তা ছিলেন তা নয়। অথচ শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় যোগাযোগ আছে। আমরা যদি এই যোগাযোগ বিশ্লেষণ করি, অর্থাৎ, অর্থনৈতিক প্রগতিতে শিক্ষার অবদান কোথায় এবং কিভাবে সেটা হতে পারে—এই জিনিসটা বিবেচনা করি, তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশুতোষের শিক্ষানীতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। হয়ত অনেকে বলবেন যে এই মূল্যায়ন একপেশে হয়ে যাচ্ছে,—কেননা আশুতোষ শুধু শিক্ষা বিস্তারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন,—অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র কোথায় তা নিয়ে তিনি আদৌ চিন্তা করেন নি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে আশুতোষের শিক্ষানীতি পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল।

প্রথমেই দেখা যাক্, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে জড়িয়ে আছে—অথবা কিভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। একটি অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে কয়টি পন্থা আছে তার মধ্যে মানবিক মূলধনে বিনিয়োগ (Investment in human capital) অন্যতম। মানবিক মূলধনে বিনিয়োগ কথাটির অন্যতম অর্থ হল শিক্ষাখাতে (সেটা সাধারণ শিক্ষা-ই হোক অথবা কারিগরী শিক্ষা-ই হোক) মূলধন বিনিয়োগ। ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ করলে আমরা যেমন তার প্রতিদানের হার (Rate of Return) বিবেচনা করি, শিক্ষাখাতে মূলধন বিনিয়োগ করলেও তার প্রতিদানের হার (Rate of Return) বিবেচনা করা হয়,—তবে সেই সঙ্গে আরও একটি জিনিস বিবেচনা করতে হয়, এবং তা হল সামাজিক ব্যয়ভার (Social cost) যতটাই থাকুক না কেন সামাজিক কল্যাণ (Social benefit) সাধনে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয়ভার বেশী হলেও সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে এই বিনিয়োগ-ক্রিয়া চালাতে হয়। আশুতোষ যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করেছিলেন তার সামাজিক ব্যয়ভার বেশী ছিল না,—অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সার্বিক কল্যাণের সম্প্রসারণ করা। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে শিক্ষা দুই রকমের হতে পারে,—একটি হল উৎপাদনমুখী শিক্ষা (Production Education) এবং অপরটি হল ভোগ-সম্পর্কিত শিক্ষা (Comsumption Education)। যে শিক্ষা মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ক'রে নূতন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং এভাবে পরোক্ষভাবে জাতীয় উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, যে শিক্ষা মানুষের উৎপাদন-দক্ষতা ও কারিগরী দক্ষতা বাড়িয়ে দেয় এবং কর্মসংস্থানের সহায়ক হয়—সেই শিক্ষাকে আমরা উৎপাদনমুখী শিক্ষা বলতে পারি। আবার যে শিক্ষা নিছক পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে জড়িত এবং ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যার কোনো মূল্য নেই,—সেই শিক্ষা উৎপাদনমুখী নয়। এই শিক্ষা মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে উন্নত করলেও এবং আত্মবিকাশের

ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে বলা হয় ভোগ-সম্পর্কিত শিক্ষা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবিক মূলধনের বিনিয়োগ প্রধানতঃ উৎপাদনমুখী শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। আশুতোষ মানবিক মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক তত্ত্বটির সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি পরোক্ষভাবে এই জিনিসটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আশুতোষ বাংলার ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট দেখতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। এজন্য গ্রামাঞ্চলে অধিকসংখ্যক স্কুল স্থাপন ও মফস্বলের শহরে শহরে কলেজ স্থাপন থেকে আরম্ভ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে বিভিন্ন বিভাগ খুলে সকলের জন্য শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। উপাচার্য হিসাবে আশুতোষ যেভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন—তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যে কোনো দেশের সমৃদ্ধির চূড়ান্ত ভিত্তি হল মানব সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার। মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে হয় এবং যারা এই দুইটি সম্পদকে কাজে লাগাতে চায় তাদের শিক্ষিত হওয়া দরকার। শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই মূলধন সৃষ্টি ও বিনিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ও পরিকাঠামো তৈরি করা এবং সর্বোপরি উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ ছাড়া মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার হয় না। এক্ষেত্রে আশুতোষের ছিল গভীর দূরদৃষ্টি। ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ (তাঁর প্রথমবার উপাচার্য থাকার শেষ সময়ে) তিনি University College of Science and Technology-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উপাচার্যের পদ চলে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের যোগসূত্র কখনই ছিন্ন হয়নি। ১৯২১ সালে পুনরায় উপাচার্য নির্বাচিত হবার পর তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছিলেন এবং এজন্য বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এসে-ছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র (প্রেসিডেন্সী কলেজ), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি. ভি. রমন, প্রশান্ত মহলানবীশ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, দেবেন্দ্রমোহন বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুযোগ্য অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যা তখনকার দিনে যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই গৌরবের ব্যাপার ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাকে সরকার প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি এবং এজন্য তার ব্যয়ভার বহন করতেও এগিয়ে আসেননি। আশুতোষ তখন রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, খয়রা এবং অন্যান্য বিদ্যোৎসাহীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেছিলেন। 'আত্মচরিত' গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজের প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁহাদের ধারণা এই যে, এদেশের জন্য যাহা কিছু ভাল তাহা সমস্তই 'মা বাপ'-রূপী আমলাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের দয়াতেই হইবে।"

যদিও আশুতোষ বিজ্ঞানচর্চার সম্প্রসারণে প্রচণ্ডভাবে উদ্যোগী ছিলেন, তবুও তাঁর আমলে কলাবিভাগের দিকেই দেশের যুবক সম্প্রদায় বেশী আকৃষ্ট হত। স্বাভা-বিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলার ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার ফলে কি দেশে কর্ম-

নিয়োগের গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত হয়নি? আশুতোষের প্রথমবার উপাচার্য থাকাকালীন (১৯০৬-১৯১৪) দেশে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা বিশেষ তীব্র ছিল না একজন গ্র্যাজুয়েটের জন্য স্কুল-শিক্ষকতার চাকরী জোটানো কঠিন ছিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বেকার সমস্যা তীব্র হতে আরম্ভ করে। আশুতোষ যখন দ্বিতীয়বার উপাচার্য (১৯২১ সালে) হন, তখন একদিকে ছিল দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন, অপরদিকে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে একটি বিপর্যস্ত অর্থনীতি। তখন দেশে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হত। অর্থনীতির পরিভাষায় সেই শিক্ষানীতি যে পুরোপুরি উৎপাদনমুখী ছিল তা-ও বলা যায় না। এক্ষেত্রে আশুতোষের শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার সার্বিক প্রসার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার সুনিশ্চিত করা। আশুতোষ যে-সময় শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি চেয়েছিলেন তখন সাধারণ শিক্ষার জন্য চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি কিরূপ ছিল ভেবে দেখা যেতে পারে। কোনো পরিবারের লোকজন শিক্ষিত হবে কিনা—অর্থাৎ পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করবে কিনা, এক কথায় তাদের শিক্ষার জন্য চাহিদা আছে কিনা তা অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা যখন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয় তখন জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা-ই বেশী চোখে পড়ে। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার জন্য চাহিদা আসে নিরক্ষরতা দূর করার তাগিদ এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রেরণা থেকে। জ্ঞানলাভের এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হলে মানুষ সমাজে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে এবং অপরকেও করাতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যারা নিজেদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য আগ্রহী তাদের মধ্যে দুইটি চিন্তাধারা দেখা যায়। এক, সন্তান শিক্ষিত হলে ভবিষ্যতে ভাল অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হবে,—ছেলে যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয় তবে তার সামনে অর্থোপার্জনের রাস্তা উন্মুক্ত হবে এবং পারিবারিক আর্থিক সমস্যারও সমাধান হবে; পারিবারিক মর্যাদাও এক্ষেত্রে বেড়ে যাবে। দুই, কাউকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে তার খরচ (cost) কত,—সেই দিকটিও ভাবতে হয়। গরীব কৃষকের পক্ষে মেধাবী ছেলেকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার করা অথবা উচ্চ সরকারী অফিসার করার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তার ব্যয়ভার করা সম্ভব নয়। ব্যয়সাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব কিনা এই চিন্তা আশুতোষের ছিল। সেজন্য শিক্ষার ব্যয় যাতে কম থাকে সেদিকে তিনি বিশেষ নজর রাখতেন। শিক্ষার যোগান যদি অব্যাহত থাকে এবং উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার যদি সরকার গ্রহণ করেন, তবে এই সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়।

আশুতোষ যখন উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হন তখন উচ্চশিক্ষার জন্য চাহিদা ও যোগান উভয়ই ছিল সীমিত। বাংলার গ্রামে গ্রামে নিম্ন মধ্যবিত্ত অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে কৃষিজীবীদের মধ্যে শিক্ষার আলোক সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করাই ছিল তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা ছিল নগণ্য। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনে তখন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন বিদ্যোৎসাহী জমিদাররা। মুষ্টিমেয় কয়েকটি জেলা শহরে তখন সরকারী বিদ্যালয় ছিল বটে,—কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বেসকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত। তখন শিক্ষকরা অনেক সময় নিয়মিত বেতন পেতেন না,— কিন্তু একটি আদর্শকে প্রেরণার

উৎস হিসাবে রেখে শিক্ষকসমাজ কাজ করে যেতেন। কলেজগুলির অবস্থাও ছিল একই প্রকার। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি মিশনারী কলেজ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল। তখনকার দিনে বেসরকারী প্রয়াসে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যতটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার পেছনে আশুতোষের অবদান কম ছিল না।

আশুতোষের শিক্ষানীতির আরও দুইটি দিক হল যথাক্রমে মাতৃভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আশুতোষের প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন চালু করা, রবীন্দ্রনাথকে কমলা লেকচারারের পদে নিয়োগ করা, দীনেশচন্দ্র সেনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে প্রেরণা দান, —এগুলি আশুতোষকে সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে যখন বাংলাদেশের যুবকরা উদ্দীপ্ত, তখন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এই বিশেষ মর্যাদা স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষের প্রয়াস ছিল ক্লান্তিহীন। এজন্য তিনি সরকারী অনুদানও অনেক ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। শিক্ষার সামাজিক কল্যাণ (social benefit) সর্বাধিক পরিমাণ করতে হলে শিক্ষাকে সরকারী লালফিতের পাশ থেকে যে মুক্ত রাখা দরকার আশুতোষ এটা বুঝতে পেরেছিলেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ শিক্ষার মূল্যও কম নয় যদিও এক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। আশুতোষের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও অর্থাভাবে তার ব্যাপক সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল না। অথচ শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা একটি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে দিতে পারে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সলো (Solow) হিসাব করে দেখেছেন যে ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তার ১২ শতাংশ সম্ভব হয়েছে মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে—আর ৮৭ শতাংশ সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উন্নয়নের মাধ্যমে। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্যে আছে উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি, কারিগরী দক্ষতা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং আরও এমন কয়েকটি অচিহ্নিত উপাদান (unidentified factors) যেগুলি মূলধন বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত নয়। আশুতোষের আমলে শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি এবং তার কারণ ছিল সরকারী অবহেলা ও অর্থাভাব। অথচ দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটা ছিল খুবই জরুরী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তখন সরকারী কলেজ হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল—দেশের কারিগরী শিক্ষা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই একটি কলেজ তখন যথেষ্ট ছিল না।

আশুতোষের শিক্ষানীতির মূল্যায়ন করলে যে জিনিসটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার তা হল,—আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও এই শিক্ষানীতিতে দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আংশিকভাবে পূরণ করার চেষ্টা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি ছিল তখন বিরাট,—সমগ্র পূর্বভারত এবং ব্রহ্মদেশ নিয়ে ছিল তার পরিধি। বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে (যদিও তখন উপাচার্যের পদ ছিল

অবৈতনিক) আশুতোষ শিক্ষাজগতে এমন একটি উজ্জ্বল নজির রেখেছিলেন যা আজও অমলিন হয়ে আছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর শিক্ষানীতি তৈরি করেননি বটে,—কিন্তু তাঁর শিক্ষানীতি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। অনগ্রসর কৃষি-প্রধান অর্থনীতিতে কৃষিজীবীদের শিক্ষিত করে তোলা যে কত জরুরী, তা অস্বীকার করা যায় না। আশুতোষ শিক্ষা-সম্প্রসারণের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন,—কিন্তু দেশের তৎকালীন অর্থনীতির পক্ষে সেই শিক্ষানীতি পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল।

আশুতোষ ঃ তাঁর সমকাল ও রাজনৈতিক মানস

ডঃ লাডলী মোহন রায়চৌধুরী

গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে যে কয়জন বাঙালী ভারতবিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন রাজনীতির জগতের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ অবশ্য এর ব্যতিক্রম। কিন্তু রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও রাজনীতির ঘটনাচক্র কবির মনে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আর বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও বাঙালীর রাজনৈতিক জীবন ও মতাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের থেকে যথাক্রমে তিন ও এক বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমকালে যে সকল বিখ্যাত ব্যক্তি জন্ম নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১), সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯) এবং চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০) রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সুবিদিত ছিলেন। আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩) মূলত কবি এবং নাট্যকার হিসাবেই গোটা বাংলা দেশে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন।

স্যার আশুতোষের কর্মক্ষেত্র এঁদের সকলের থেকেই কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। সাহিত্য, সন্ন্যাস বা রাজনীতি—এগুলির কোনটিকেই তিনি তাঁর একক কর্মক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর সঙ্গে বরং কিছুটা স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৪—১৯১৮) তুলনা করা চলে। স্যার গুরুদাসের মত তিনিও একজন গণিতবিদ্ হিসাবে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই প্রধানত হাইকোর্ট, বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিস্তার—এই তিন কর্মক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এই সব কাজের সুবাদে তাঁদের কখনো কখনো অনিবার্য ভাবেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা কেউ-ই রাজনীতির মানুষ হিসাবে সচরাচর চিহ্নিত হন না।

আশুতোষের আয়ুষ্কালের মধ্যে ভারতবর্ষের মূল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহটি এই প্রসঙ্গে একবার খতিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে। ঘটনাগুলি তালিকার আকারে এখানে পেশ করা হল ঃ

১৮৭৮ : ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট
১৮৮৩ : ইলবার্ট বিল
১৮৮৫ : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৮৯১ : এজ অফ কনসেন্ট এ্যাক্ট
১৮৯২ : ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট
১৮৯৬ : বোম্বাইয়ে প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, উগ্র জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ
১৯০৪ : ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ এ্যাক্ট
১৯০৫ : বঙ্গ বিভাগ

১৯০৬ : জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক 'স্বরাজ' লক্ষ্যের ঘোষণা
১৯০৯ : মর্লি-মিন্টো রিফর্মস
১৯১৬ : হোমরুল লীগ
১৯১৯ : মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন
১৯২০ : অসহযোগ আন্দোলন
১৯২৩ : স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা

উপরোক্ত তালিকায় রাজনীতির আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়নি। কিন্তু যে কয়টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সেইগুলিও এই যুগের রাজনৈতিক অস্থিরতার কাহিনী মনে করিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এই অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল ইংরাজের কঠোর শাসননীতি—যার নমুনা ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট, ইলবার্ট বিল, জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর গ্রেপ্তার, বঙ্গবিভাগ, জালিনওয়ালাবাগ, রাউলাট আইন প্রভৃতি। অভিজ্ঞ পাঠক জানেন যে ইংরাজের এই বজ্রমুষ্টির শাসন পরাধীন ভারতবাসীর মনে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেসের প্রথম যুগের মডারেট প্রতিবাদী আন্দোলন এবং আরো পরে বঙ্গবিভাগোত্তর যুগের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ—এই দুই ধরণের আন্দোলনে সেকালের জনচিত্ত যার-পর-নাই মথিত হয়ে উঠেছিল।

কৈশোরে আশুতোষের জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল বিদ্যার্জন ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। সুতরাং যৌবনের প্রথমাবধি সেই কাজেই তিনি নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। তাঁর বাবা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সোচ্চার ভাবে ইংরাজ-বিরোধিতা করেন নি। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক। ইংরাজ সরকার গঙ্গাপ্রসাদকে তাঁর প্রথম যৌবনে সরকারী ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু শোনা যায় যে এই চাকুরির শর্ত হিসাবে তাঁকে প্যান্টালুন পরে আসার উপদেশ দেওয়ায় তিনি ঘৃণাভরে সেই চাকুরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই মর্যাদাবোধ তথা স্বদেশীয়ানার স্ফুরণ আশুতোষের সারা জীবনে অনেকবারই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৮৩ সালের মে মাসে সুরেন্দ্রনাথকে যখন ইংরাজ সরকার গ্রেপ্তার করে সেই সময় কিশোর আশুতোষের মধ্যে এই দাপট প্রথম লক্ষ্য করা যায়। সরকারী হুকুমনামার প্রতিবাদ করে সেদিন যে ছাত্র-মিছিল রাজপথে পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা করে তার পুরোভাগে ছিলেন আশুতোষ। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এই ঘটনা উল্লেখ করে লেখেন—"বিচারে আমার প্রতি শাস্তিদানের রায় ঘোষণা করার পরে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে ছাত্রগণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা বাড়ীঘরের জানলাগুলি ভাঙতে আরম্ভ করল এবং পুলিশের গায়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সেই বেপরোয়া যুবকদের মধ্যে একজন ছিল আশুতোষ মুখার্জী যিনি পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে এত নাম করেছেন।"

আশুতোষের মধ্যে এই বেপরোয়া মানসিকতার আরো একবার প্রকাশ ঘটে ১৮৮৭ সালে। ঐ সময় তিনি তখনও আইন ক্লাসের ছাত্র এবং মাত্র দু বছর আগে এম. এ. পাশ করে উপযুক্ত চাকুরির সন্ধানে নিযুক্ত। তদানীন্তন ডি. পি. আই স্যার চার্লস ক্রফট এই খবর জানতে পেরে তাঁকে সরাসরি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু আশুতোষ যখন জানতে পারলেন যে এই ধরণের চাকুরীতে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় অধ্যাপকদের মধ্যে বেতন-বৈষম্য করা হয় তখন তিনি সরাসরি

গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দেন যে এই রকম অযৌক্তিক বৈষম্য করা হলে তাঁর পক্ষে সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কর্তৃপক্ষ তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন নি। ফলে আশুতোষও সেই চাকুরী গ্রহণ করতে পারেন নি।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে আশুতোষ মাত্র পাঁচ বছর যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে তিনি কলকাতা কর্পোরেশন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পর্ষদের সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন। কর্পোরেশনের সভায় তিনি খুব নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। কিন্তু সভাগুলিতে তিনি যখনই হাজির হতেন তখন প্রতিবারই তিনি নিয়ম করে করদাতাদের (rate payer) স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষভাবে মন দিতেন। পৌর কাজকর্মের অজুহাতে শহরের পথঘাটগুলি বন্ধ করে রাখা হলে কিংবা সেগুলি ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় না থাকলে, তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁরই উদ্যোগে কলকাতার কয়েকটি রাস্তার নতুন নামকরণ হয়েছিল। কর্পোরেশনের কাজে তিনি মাত্র অল্পদিনই নিযুক্ত ছিলেন। তবু সেই কয়দিনেই তিনি একজন বাস্ত কাউন্সিলর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই সব সমাজসেবার কাজে তাঁর এতটাই উৎসাহ ছিল যে একদা জনপ্রতিনিধিদের বেতন বা ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে যখন একটি বেসরকারী প্রস্তাব আসে তখন আশুতোষই সর্বপ্রথম সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করতেন যে সমাজকল্যাণের প্রেরণাতেই মানুষ এই সব কাজে এগিয়ে আসেন। টাকা দিলে তাঁদের এই সেবার মনোভাবকে প্রকারান্তরে অপমানই করা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে আশুতোষের সবচেয়ে বড় কাজ হল ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরোধিতা। ১৮৮১ সালে পৌরসভাগুলির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর সরকারের তরফে সেই ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য বহু রকমের চেষ্টা করা হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাবে এই ব্যবস্থাকেই আইনে পরিণত করার চেষ্টা হয় (১৮৯৯), আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ এবং আশুতোষ ব্যবস্থাপক সভায় এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। বিলটির সমালোচনা করে আশুতোষ বলেন যে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের উৎখাত করার জন্যই ম্যাকেঞ্জি বিল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং এই বিলকে কোন মতেই আইনে পরিণত হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আশুতোষ কিংবা সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের সমালোচনা সত্ত্বেও লর্ড কার্জন এ ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আশুতোষের তিরোধানের মাত্র এক বৎসর আগে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই আইন বাতিল হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জি বিল ছাড়াও আশুতোষ ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন বছরের ব্যয়ানুমোদন প্রস্তাব বিষয়েও আলোচনা ও বিতর্কে প্রায়শই অংশগ্রহণ করতেন। ১৯০০—১৯০৫ সালের মধ্যে তিনি অন্তত চারবার শিক্ষা, আইন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সমালোচনা করেন। বিতর্কের সময় তিনি নানারকম যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে এই সব প্রয়োজনীয় খাতে সরকারের বরাদ্দ নিতান্তই অপ্রতুল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতারা ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বয়কট করার জন্য আহ্বান করেন। আশুতোষ এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯০৬—১৪)। তিনি এই বয়কটের বিরোধিতা করেছিলেন। এর মাত্র দু বছর আগে তিনি লর্ড কার্জনের ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের বিরোধিতা করেছিলেন। এই আইনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউরোপীয় সদস্যদের সংখ্যা বর্ধিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং মূলত সেই কারণেই তিনি এই আইনের সমালোচনা করেন। তাঁর এই

প্রকাশ্য সরকার বিরোধিতার জন্য তিনি জাতীয়তাবাদী মহলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক ঐ একই সময়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভায় গোখেল প্রস্তাবিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিলটিকে স্বাগত জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে দেশ-বাসীর একাংশের মনে আশুতোষ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। এর উপর বয়কটের প্রস্তাবে যখন অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসী ঐকমত্য প্রকাশ করে তখন একা আশুতোষ এর বিরোধিতা করে জনমানসে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। তাঁকে নিয়ে ভুল বোঝা-বুঝির পরিবেশ তৈরী হয়েছিল।

স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র (National Council) বা স্কুল-কলেজ বয়কটের পরিকল্পনায় নীতিগত ভাবে তাঁর সায় না থাকলেও সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী বয়কট আন্দোলনে যে-সব ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধানে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আসলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনুরাগী হিসাবে তিনি কোন কিছুর বিনিময়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারতবাসীর সার্বিক বিকাশের জন্য সেই যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা একান্ত আবশ্যক ছিল। স্বদেশী নেতাদের পরিকল্পিত জাতীয় কাউন্সিল আশুতোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে দেশের শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই তিনি বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীর মানুষকেই রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়ে-ছিলেন। শিক্ষাকে জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বিষয়ে মর্লির কাছে লেখা মিন্টোর একটি চিঠি (তাং ৩০ নভেম্বর ১৯০৮) থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে। মিন্টো লিখছেন "Dr. A. Mukherjee tells me that the national schools and private colleges are hotbeds of sedition, and that till we deal with them we can have no permanent peace" (ডঃ এ. মুখার্জি আমাকে বলেন যে জাতীয় বিদ্যালয় এবং বেসরকারী কলেজগুলি রাজদ্রোহের কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়েছে। এইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আমরা কখনোই স্থায়ী শান্তি ফিরে পাব না)।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও আশুতোষ শিক্ষাক্ষেত্রে বয়কট প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। সারা দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্র বিদ্যায়তনে অনুপস্থিত থেকে অসহযোগ নিয়ে মাতামাতি করবে এই চিন্তায় আশুতোষ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বয়কট করার বদলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো বড় করে গড়ে তুলবার জন্য যেন চেষ্টা করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বিদেশী বা বিজাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে ভাবতেই পারতেন না। তাই সেনেট হল থেকে একদা ছাত্রদের সরাসরি আহ্বান করে তিনি জানালেন "You want a Swadeshi University. Is not Calcutta University your university? The Senate and the Syndicate are in the hands of the Bengalis. It is fostered by the donations of the sons of Bengal. Everyone is in native dress. There is no foreign influence here. Should you insult this noble patriotism, this generous self-sacrifice?"

বয়কটের প্রশ্নে আশুতোষ চলতি হাওয়ার পন্থী হতে পারেন নি বলে যাঁরা তাঁর

সমালোচনা করেন তাঁরা ভুলে যান যে আশুতোষই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে স্বদেশীয়ানার মেজাজ তৈরী করতে সমর্থ হয়ে ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলাকে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বয়কট প্রস্তাবে সায় না দিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করতে চেয়েছিলেন বলে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছিলেন তাঁরা জানেন না যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের স্বার্থেই তিনি অচিরাৎ সেই সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতেও পিছিয়ে আসেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাকে মনোমত গড়ে তোলার জন্য ১৯১৩ সাল নাগাদ আশুতোষ সেনেটের অনুমোদন নিয়ে কে পি জয়াসওয়াল, আব্দুল রসুল এবং ডঃ সুরাবর্দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই সব অধ্যাপকেদের সঙ্গে বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগ আছে এই অছিলায় সরকার এঁদের নিয়োগ অনুমোদন করতে অস্বীকৃত হন। বিষয়টি নিয়ে সরকারের শিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী এইচ শার্প এবং মাননীয় শিক্ষা বিষয়ক সদস্য হারকোর্ট বাটলারের সঙ্গে আশুতোষের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। আশুতোষ নীতিগত ভাবে শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সেনেটের অনুমোদন সহ যে-সব শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়েছে সরকারী আমলাদের খেয়াল অনুযায়ী তাঁদের কর্মচ্যুত করতে তিনি রাজী হন নি। তাঁর মতে সরকার কোন অবস্থাতেই সেনেটের কাজে এই রকম অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষের মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিমধ্যে উপাচার্য হিসাবে আশুতোষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সরকার সাময়িক ভাবে তার মুখ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে বিষয়টি পরোক্ষ-ভাবে উল্লেখ করে সরকারের একগুঁয়েমির প্রতি প্রকারান্তরে কটাক্ষ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে বলা হয়—"A university which deserves that name ought to be so constituted that it can be trusted to carry on its purely academic affairs without constant interference."

১৯২১ সালে আশুতোষ দ্বিতীয় বারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। কিন্তু এই যাত্রায় তাঁর পক্ষে পুরো মেয়াদের জন্য কাজ করা সম্ভব হয়নি। গভর্ণর লর্ড লিটনের সঙ্গে উপাচার্যের বিরোধ বাধে। সরকার যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন উপাচার্য তা আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছিলেন না। তাছাড়া সরকারের প্রস্তাবিত বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এডুকেশন সম্পর্কেও উপাচার্যের আপত্তি ছিল। এই মতদ্বৈধের ফলে পরিস্থিতি যখন রীতিমত জটিল আকার ধারণ করেছিল সেই সময় আশুতোষকে লেখা লিটনের কয়েকটি চিঠি বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিল। এই সব চিঠিতে আশুতোষকে সরাসরি এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে তিনি নাকি অতীতে সব সময়েই সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতা করে এসেছেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে আশুতোষ যদি সরকারের কয়েকটি প্রস্তাব মেনে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন তবেই তাঁর চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারটি সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। একই সঙ্গে আশুতোষকে এ-কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে সরকারের কাছ

থেকে আর্থিক অনুদান পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া সরকারের কয়েকটি প্রস্তাব অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

লিটনের কাছ থেকে শর্তাধীন চাকুরীর প্রস্তাব পাওয়ার পর বাংলার বাঘ কি ভাবে হুংকার দিয়েছিলেন সে কাহিনী আজ সর্বজন বিদিত। তিনি গভর্ণরকে তদ্দণ্ডে একটি প্রত্যুত্তর জানিয়ে লিখলেন—"আপনার ১৫.২.২৩ তারিখের চিঠির জবাবে একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যা স্বাভাবিক আমিও ঠিক সেই রকমটিই করতে চাই। অর্থাৎ আপনি এবং আপনার পরামর্শদাতারা যে উত্তর প্রত্যাশা করেন এবং আপনারা ঠিক যেমনটির যোগ্য আমিও সেই রকম প্রত্যুত্তরই দিতে চাই। আপনি যে অপমানজনক প্রস্তাব আমাকে দিয়েছেন আমি বিনা দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করছি" ("I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send—an answer which you and your advisers expect and deserve. I decline the insulting offer you have made to me.")। একই সময়ে তিনি তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে জনতার সম্মুখে তাঁর সেই দুর্মর স্বাধীনতাস্পৃহার বাণীটি ঘোষণা করেছিলেন—"Freedom first, freedom second, freedom always—nothing less would satisfy me."

যে আত্ম-মর্যাদাবোধ মানুষের মনে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয় আশুতোষের মনে তা সর্বদাই জাগ্রত ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একাংশের মনে যে উগ্র হিন্দুত্ববোধক স্বদেশীয়ানার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল (এবং যার প্রভাবে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এ-দেশে তথা-কথিত সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি জন্ম নিয়েছিল) যাকে টয়েনবির পরিভাষায় 'আর্কেইজম' বলে চিহ্নিত করা যায়, আশুতোষের মধ্যে তার প্রভাব পুরোপুরি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁর উৎকট গোঁড়ামি, নগ্ন এবং স্ফীত বক্ষোদেশ, যজ্ঞোপবীতের আতিশয্যময় আস্ফালন, হেঁটো ধুতি মায় তাঁর ভীমনাগের সন্দেশ প্রীতি—এই সব দেখে আজকের যুগের কোন তরুণ হয়ত নাসা কুঞ্চন করবেন। কিন্তু বিদেশী শাসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ কোন মর্যাদাসম্পন্ন ভারতবাসী তাঁর অবমানিত সত্তাকে প্রশমিত করার জন্য এই রকম উগ্র স্বদেশীয়ানা প্রদর্শন করেই আত্মতৃপ্তি বোধ করতেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী হয়েও আশুতোষ কোনদিন বিলেত যাওয়ার চেষ্টা করেন নি, কারণ বিলেত যাওয়া তাঁর কাছে নিছক অন্ধ পরানুকরণ এবং পরানুবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯০৭ সালের সমাবর্তন বক্তৃতায় আশুতোষ ছাত্রদের কাছে যে-কথা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—"In your just admiration for all that is best in the Culture of the West, do not, under any circumstances, denationalise yourself."

শোনা যায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দ আশুতোষের সহপাঠী ছিলেন। এই দুই মনীষীর কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও স্বদেশ-প্রেমের বেপরোয়া দাপট এঁদের উভয়ের জীবনকেই মহিমান্বিত করে তুলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন—"সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ"। আর আশুতোষ এই কথাটিই অন্য আর এক ভাবে বিনয়কুমার সরকারের কাছে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"It is your national leaders the Swadeshiwalas of today who dare not appear in

public in the streets of Simla or Darjeeling or even in Calcutta with their dhoti and slippers on for fear lest they should be observed by their foreign acquaintances, but I the son of a Brahmin have not in my life, felt ashamed to expose my sacred thread to the graze of the foreigners. Cowards at heart as there leaders are, how can they command respect from foreigners or emancipate the mind of Young Bengal or inculcate in young minds the spirit of independence and equality with the ruling race?"

সেকালের (এবং এই যুগেরও বটে) আর পাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত আশুতোষও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষক বা অধ্যাপকের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ তার ফলে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, ১৯২৩ সালে উপাচার্যের পদ থেকে সরে আসার পর আশুতোষের মনে বোধ হয় এই সযত্নলালিত বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল! তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন যে চাইলেই রাজনীতি থেকে সরে আসা যায় না। পরিস্থিতির চাপে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে ম্যালকম হেইলি এবং জেমস ক্রিরার নামে দু জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর মধ্যে এই সময়ে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তার একটিতে (তাং ১৭.৬.১৯২৩) এই বিষয়ে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ইংগিত খুঁজে পাওয়া যায়। হেইলি লিখেছেন যে সম্প্রতি তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি খবরে জানতে পেরেছেন যে আগামী কাউন্সিল নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য স্যার আশুতোষ প্রস্তুতি শুরু করেছেন। হেইলি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে একজন বিচারপতির পক্ষে এইভাবে রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করা হয়ত

শোনা যায় যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কোন কোন সংবাদপত্রেও এই বিষয়ে আইনসম্মত হবে না।

অসংলগ্নভাবে কিছু খবর ছাপা হয়েছিল। ১৯২৩ সাল নাগাদ কাউন্সিল এন্ট্রির প্রশ্নে সেই সময় স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে জোর নির্বাচন প্রস্তুতি চলছিল। স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও নাকি এই ব্যাপারে স্যার আশুতোষের সঙ্গে কথা বলে একটি নির্বাচনী পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয় যে নির্বাচনের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সরাসরি পেশ করা হবে এবং স্যার আশুতোষ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এই কাজে স্বরাজ্য দলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন। অন্য আর একটি খবর থেকে জানা যায় যে আসন্ন নির্বাচনে যে ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তার একটি পক্ষে থাকবে Independent Liberal দল এবং স্বয়ং স্যার আশুতোষ এই দলের নেতৃত্ব দেবেন। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দেশবন্ধুর প্রাথমিক ভাবে কথা বার্তাও সম্পন্ন হয়েছে।

এই জনশ্রুতির সত্যাসত্য নিরূপণ করার উপায় নেই। সরকারী মহল থেকে এ বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে অনুসন্ধান করার পর গোটা ব্যাপারটিকে নিছক গুজব বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সুরেন্দ্রনাথের মত একজন দায়িত্বশীল নেতাও বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সরকারের

একজন উচ্চ পদস্থ আমলার কাছে লেখা সুরেন্দ্রনাথের এই সময়কার একটি চিঠিতে এ কথা স্বীকার করা হয়—"As regards the seats which will be contested at the forthcoming elections to the Council, Mr. C. R. Das is said to have come to an arrangement with Sir Asutosh Mukherjee who will himself lead a party based on the Calcutta University question." ১৯২৩ সালের শেষ দিককার একটি সরকারী ফাইলেও এই বিষয়ে একটি নোট দেখতে পাওয়া যায়—"From all available accounts it is clear that there will be a keen contest during the next general election. In Bengal the fight will be a triangular one (including) those who call themselves 'Independent Liberals' and so far as is known, Sir Asutosh Mukherjee will be the central figure." প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকারী ফাইলের এই মন্তব্যের সঙ্গে স্বরাজ্য দলের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর (১৪.১০.১৯২৩) সঙ্গতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ম্যানিফেস্টোতে সরকারের বিরুদ্ধভাবাপন্ন সকল মানুষ এবং দলকে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল—"the party would also readily accept the invitations of other parties to join with them for the purpose of defeating the government on any non-official measure opposed by the government or on an official measure opposed by the inviting party or member."

কিন্তু দুই আর দুই-এর যোগফল মেলেনি। আশুতোষ শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নি। কি কারণে তিনি পিছিয়ে এসেছিলেন তা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধা কাটিয়ে এসেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে এসেছিলেন তার জন্য ভাগ্যদেবীও কম দায়ী ছিলেন না। কেননা ১৯২৫ সালের ২৫ মে তারিখে তিনি অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রবন্ধ রচনায় যে-সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

The Calcutta Review, July, 1925
The Indian Annual Register, 1925, I, 1926, II.
Sarkar Sumit, The Swadeshi Movement in Bengal.
Sen S. P., Dictionary of National Biography, Vol. III.
Sinha N. K., Asutosh Mookerjee, A biographical study.

আশুতোষ কালপর্যায়ের ভারত
(১৮৬৪—১৯২৪)

শ্রী রণেন ঘোষ

ভারতের এই কালপর্যায়ের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ঔপনিবেশিক যুগের বণিক পুঁজি, পণ্যের বাজার ও মূলধন সঞ্চয়ের, এক কথায় পণ্য অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মের, প্রক্রিয়ায় অভিষিক্ত।

আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রামের ফলে সেখানকার উপনিবেশগুলি ব্রিটিশের হাত-ছাড়া, ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকদের প্রায় বিতাড়ন, ১৮৩৩-এ চীনের বাজার হাতছাড়া, ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের উন্মুক্তি, ১৮৫৪তে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ডে শন রপ্তানী বন্ধ। বিশ্বের অর্থনৈতিক ধারায় নির্দিষ্টভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে সংগঠিত বাণিজ্যিক পুঁজি বণিকপুঁজির স্থলাভিষিক্ত হল যার পেছনে রইল রাষ্ট্রীয় শক্তি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ইংল্যান্ডের কলকারখানার প্রসারের জন্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, ইংল্যান্ডের যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের বাজার গড়ে তোলা, কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি, বৃটিশ পণ্যদ্রব্য চালানের সুবিধার্থে যানবাহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১৮৫৬ সাল পর্যন্ত বণিক পুঁজির কাজ ছিল প্রধানতঃ ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী, জায়গা-জমি, গৃহসম্পত্তি ক্রয়, গুদামঘর তৈরী। ১৮৫৪—১৮৫৯ পর্যন্ত ১৫০ মিলিয়ান পাউণ্ডস্ বৃটিশ পুঁজি ভারতে নিয়োজিত হয়েছে। ১৮৭০-এ প্রায় ৭৫ মিলিয়ান পাউণ্ডস রেলপথে, ২০ মিলিয়ান পাউণ্ডস বাগিচাশিল্পে, চটশিল্পে ও ব্যাঙ্কে নিয়োজিত হয়েছে।

এই যুগে পুরাতনকে চূর্ণ, দীর্ণ ও ধ্বংস করার প্রচণ্ডতার তুলনায় আনুপাতিক-ভাবে নতুন যুগের আবির্ভাবের জন্য কাঠামো গঠন ও নির্মাণের হার খুবই দুর্বল।

ভূমিব্যবস্থার থেকে ভূমিহীন কৃষকের উৎপত্তি, কৃষিঋণ বৃদ্ধি, কুটীর শিল্পের ধ্বংসের ফলে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার সমস্যা, কৃষিশ্রমের অভাব, কৃষিশিল্পের বিস্তার, শিল্পশহর গড়ে ওঠা, শহরে শিল্পের উৎপত্তি—এককথায় জমির অধিকার এবং রাজস্ব সম্পর্কে নানা জটিলতার সৃষ্টি।

মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতি মধ্যযুগের বংশপ্রধান কৌলীন্য ও রক্তসম্পর্কের আভিজাত্যকে ভেঙে প্রতিষ্ঠা করল অর্থনৈতিক কৌলীন্যের যুগকে।

দ্রুত পণ্য বনাম মুদ্রা সম্পর্ক ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানার অধিকার মজবুতি আসলে ভূমির মূল্যধারী হওয়ার এবং ক্রমাগত অধিক পরিমাণে বাজারের পণ্য সংবহনের আওতাধীন হওয়ারই নামান্তর। এভাবে জমির দরের দ্রুত বৃদ্ধি কৃষি উৎপাদনের সাধারণ দরবৃদ্ধিকে অতিক্রম করে। অনুন্নত পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের প্রেক্ষিতে অতঃপর বণিক, মহাজন ও সামন্তদের পক্ষে তাদের সঞ্চিত অর্থলগ্নীর অনুকূলতম পথ তৈরী হয়।

ভারতীয় কৃষির অর্থনৈতিক ভিত্তি কিন্তু মূলতঃ পরিবর্তন হল না। ভূমি রাজস্বের

ওপরে নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল। ১৮৮১—১৮৯১ এর মধ্যে ভূস্বামীদের সংখ্যা ২৫ লাখ থেকে ৪০ লাখে পৌঁছে গেল। ১৯ শতকের মাঝামাঝি বিশ্বের অর্থনৈতিক ধারায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল—বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বিশ্ববাজারে একচেটিয়া অবস্থান।

অসংগতিপূর্ণ ঔপনিবেশিক কৃষিনীতি ভূমি-রাজস্ব সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূমি মালিকানায় গোষ্ঠীগত বিন্যাস, ভূমির মালিকানা স্বত্বে অবৈজ্ঞানিক স্তরবিন্যাস, সামন্ত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানাকে পাকাপোক্ত করে তুলেছিল। সরল পণ্যোৎপাদনের বিকাশ কৃষি উৎপাদনে ও কুটীর শিল্পে বাণিজ্যিক ও তেজারতি পুঁজির গভীরতর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল।

১৮৫০-৫১ সালেই ১৯,৩০০, ০০০ পাউন্ড রাজস্ব আদায় হলেও বৃটিশ সরকার ভারতের জনকল্যাণের কাজে শতকরা ০·৮ ভাগ অর্থাৎ ১৬৬,৩৯০ পাউন্ড ব্যয় করেছে। প্রথম থেকেই অবিভক্ত বাংলা ছিল ভারতের কামধেনু। মোগলযুগ, কোম্পানীর আমল ও বৃটিশ যুগে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

বৃটিশ পুঁজি প্রধানতঃ রেলপথ, জলসেচপ্রকল্প, বাগিচাশিল্প, খনি ও কারখানা নির্মাণেই নিয়োজিত ছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদানের উল্লেখ কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে। ১৯ শতকের ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৩০০ কি, মি,—২৫,০০০ কি. মি.-এ পৌঁছেছিল। রেলপথের বিন্যাসটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, ঔপনিবেশিক চাহিদা অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে প্রধান বন্দর এবং বৃটিশের প্রধান কর্তৃত্বাধীন ঘাঁটিগুলির সঙ্গে সামরিক ও স্ট্র্যাটেজিক ভিত্তিতে যুক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ এলাকা সংযোগকারী লাইনের মালের ভাড়া ছিল অভ্যন্তরের সঙ্গে বন্দর যোগাযোগকারী লাইনের ভাড়ার চেয়ে বেশী। রপ্তানীর লক্ষ্যেই দেশের অভ্যন্তরে পণ্য সংবহনের বিকাশ স্বভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। ব্রডগ্যেজ, মিটার গ্যেজ এবং ন্যারো গেজের ফলে পথসন্ধির আভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছিল।

এই যুগে ভারত থেকে নিষ্কাশিত খাজনা, ডিভিডেন্ড, সামরিক, প্রশাসনিক কর্মচারীদের পেনশন, যুদ্ধের খরচা বাবদ নিষ্কাশিত মুদ্রার পরিমান ছিল ১০ কোটী পাউন্ড। ১৯ শতকের শেষার্ধে ঔপনিবেশিক পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়ার দুটি মূল শর্ত পূর্ণ হয়েছিল—একটি হ'ল উৎপাদন উপায়হীন মুক্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব, আর একটি হল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক পুঁজির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে মুৎসুদ্দিদের পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়। অর্থনৈতিক উপাদানের ক্ষেত্রে ভারতের আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্যের দরপার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতসহ এশিয় দেশগুলিতে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যহ্রাস ঘটায় ব্যবসা ও অসমতুল্য বিনিময়ে কেবল বৃটিশ রপ্তানীকারকরাই লাভবান হয়েছিল। জনগণের সঞ্চয়ের মূল সামগ্রী রূপার অলঙ্কারপত্রের মূল্যহ্রাসে একটি নতুন আঘাত।

১৮৯৬—১৯১০ সালের মধ্যে বৃটিশ পুঁজি পাঁচশো কোটি টাকা থেকে ৬০০-৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ পুঁজির অর্ধেকেরও বেশী ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকর্তৃক চালুকৃত বন্ড বা নিদর্শনপত্র। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানার সঙ্গে একযোগে বিশেষতঃ বাণিজ্যিক ও তেজারতি পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে। রায়তওয়ারী

এলাকায় ভূসম্পত্তির দ্রুত ঘনীভবনের ফলে দরিদ্র-কৃষকের জমি, জমিদার ও ধনী কৃষকের কুক্ষিগত হয়। ব্যাপকতর বাণিজ্যিক চাষ-আবাদ ও শহরগুলিতে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের কেন্দ্রীভবন গ্রামাঞ্চলে নতুন শক্তির বিন্যাসকে ত্বরান্বিত করে।

১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে কৃষির জনসংখ্যা ৬৬% থেকে ৭২%-এ পৌঁছে যায়। ১৮৯১ সালে কুটির শিল্পে রত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪·৫ কোটি। জমিদারদের খামারে ভাড়াটে শ্রম ব্যবহারের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটেছিল। উপরোক্ত উপাদানগুলি থেকে ধ্বংসাত্মক ও নতুন যুগের ভিত্তিগত নতুন গড়নের উন্মেষ লক্ষণীয়।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় শ' তিনেক আইন জারি ছিল, তবু এরই মধ্যে থেকে প্রায় শ' খানেক বাঙালী বেনিয়ানদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই।

দু একটি উদাহরণ অনুধাবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, হাওড়ার কিশোরীলাল মুখার্জীর শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস্ (১৮৬৭), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যল ওয়ার্কস্, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (১৯০৬), কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল (১৯০৮), ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্ (১৯০৯), ট্যাংরা রোড গ্লোব সিগারেট কোম্পানী, হাতিবাগান, রাজাবাজার, উল্টোডাঙ্গা ইত্যাদি জায়গায় ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিল, বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী এ যুগের ল্যান্ডমার্ক।

এই কালপর্বে ভারতীয় ব্যাঙ্ক পুঁজি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত। ১৮৮৬—১৯০৫ সালের মধ্যে সুতিকাপড় উৎপাদনকারী মিলগুলির (এগুলির অধিকাংশই ভারতীয়দের) সংখ্যা ৯৫ থেকে ১৯৭তে পৌঁছায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যেই Resumption Proceedings-এর মাধ্যমে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের নিষ্কর জমিগুলি দখল করে নেওয়ায় বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেননা মোঘল আমলে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদেরই তমগা আইন, মদদ্-ই-খাস্ ও অন্যান্য নামে প্রচুর লাখেরাজ জমি দান করা হত।

ঔপনিবেশিক পুঁজির এবং তারই উপরিসৌধ রাষ্ট্রকাঠামোর সংহতির পর্যায়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য এই শাসনের মধ্যে থেকেই শাসনের অবসানের মৃত্যুবীজও প্রোথিত হয়েছে। পুরোনো যুগের ভাষায় শূদ্রশক্তি নতুন যুগের ভাষায় শ্রমজীবী শক্তি। ঔপনিবেশিক পুঁজি আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্যসমাজের জাড্য সংঘাতের রেসিস্ট্যান্ট ফোর্স হিসেবে এই পর্যায়ে ভারতীয় অর্থনীতি, এশিয়াটিক সমাজ, সামন্তবাদী উপাদান ও পুঁজিতন্ত্রের অঙ্কুরসহ বিশিষ্টতার জটিল প্রক্রিয়ায় আকীর্ণ।

ভারতের এই কালপর্যায়ে বাংলার সামাজিক গড়ন মুৎসুদ্দী পুঁজী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যে স্তরে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, স্কুলশিক্ষক, পণ্ডিত, ভূস্বামীবর্গ, ধর্মসংস্কারক ধর্মের প্রবক্তা হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান সবই ছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থায় বৃটিশ শাসনের প্রতি মোহগ্রস্ত মানসিকতা ছিল মূল সুর। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতার মধ্যেও কিছুটা সংশোধিত পর্যায়ে মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের সুবিধা করে নেওয়ার অভিপ্রায়ই ছিল এই যুগের মানসিকতা।

এই কালপর্যায়ের শেষের দিকে শ্রমজীবী আন্দোলনের মধ্যেও এই উদারনৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধান।

এই কালপর্যায়ে সাড়ে চার কোটি কুটির শিল্পী, পাঁচ লাখের মতো শ্রমজীবী এবং পঞ্চাশ লাখের মতো কৃষিজীবী থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দেড় হাজার ভূস্বামী, কয়েক ডজন আই. সি. এস, কয়েক হাজার স্কুল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক শ-দুয়েক ব্যারিস্টার-উকিল-মোক্তারদের দেখি নেতৃত্বে অথচ কলকাতার কাছেই বজবজে এবং হাওড়ার চটকল এলাকায় এত মজুর থাকা সত্ত্বেও এদের সঙ্গে সংযুক্তির প্রামাণিক বিবরণ এখনও অপ্রতুল।

১৮৩০ থেকে ডিরোজিওর নেতৃত্বে যে সামাজিক শ্রেণী সমাজের নেতৃত্ব করেছিলেন তারা কাগজে কলমে সংবাদপত্রে বক্তৃতায় এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে মেমোরান্ডামের মধ্যে দিয়ে এদের কথা হাজির করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম বরানগরের শশীপদ ব্যানার্জী যিনি শ্রমিক সংগঠন, 'শ্রমজীবী' পত্রিকা এবং পুরুষ ও স্ত্রী মজুরদের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই শশীপদ ব্যানার্জীই ১৮৭০ সালে প্রথম শ্রমিক আইনের জন্য দরবার করেন।

ঠিক এর পাশাপাশি আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এটি লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই কালপর্যায়ের অনেক পূর্বেই ১৮৮৮ সাল থেকে ইউরোপে ছাত্ররা শ্রমজীবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাস্তায় ব্যারিকেড করেছে, ধর্মঘট করছে, পুলিশের গুলির মুখোমুখি হয়েছে। এই পর্যায়ের সামাজিক শ্রেণী যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের কর্মক্ষেত্র দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উচ্চকোটি ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উপলব্ধির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আইনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সর্বত্রই উদারনৈতিক মানসিকতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। যে ভারতবর্ষে ডিরোজিওর কালপর্ব থেকে 'এজ অফ রিজন' এবং 'রাইট অফ এ সিটিজেন' বই এসেছে সেখান থেকে ফিরে গিয়ে সমাজ সংস্কারের মধ্যে, হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার মধ্যে ইংরেজিয়ানার নকলনবিশির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

এই কালপর্যায়ে যত সংগঠন গড়ে উঠেছে তার ৯০ ভাগই এই বিশেষ সামাজিক শ্রেণী। যত আন্দোলন হয়েছে তার স্থানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিশিষ্ট ভূস্বামীদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। যত আন্দোলন হয়েছে তার ৯৯ ভাগই এই বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যত ফাঁসি হয়েছে তার সবটাই মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে থেকেই। যত ছেলেরা ডাকাতি করেছে তার সবই এই সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে থেকেই। এই কালপর্যায়ের বিশেষ বিশেষ দিক্‌চিহ্নগুলিকে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজগম্য হতে পারে। আত্মীয়সভা থেকে গুপ্তসংঘ পর্যন্ত সবই এই সামাজিক শ্রেণীর মানুষজনে ভর্তি। বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা স্টুডেন্টস আসোসিয়েশন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের অধিকর্তা সবই প্রায় এই শ্রেণী থেকে এসেছে।

উনিশ শতকের আশির দশক থেকে শ্রমজীবিদের সংগঠন যে দ্রুতিতে গড়ে উঠেছিল তা অতি চমকপ্রদ। প্রায় অর্ধশত শ্রমজীবিদের সংগঠন এই বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর কাছে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এ

সংগঠনের যুক্ত হওয়ার নজির খুবই স্বল্প। এই কালপর্যায়ের সামাজিক নেতৃবৃন্দ নানা কার্যকারণে বিভিন্ন আন্দোলনের স্বার্থে সারা ভারতবর্ষেই গিয়েছেন অথবা যোগাযোগ রেখেছেন। তা সত্ত্বেও এ বিষয়টির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের স্বল্পতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

এই সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিদেশেও যোগাযোগ করেছেন স্বয়ং হাজির থেকেছেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্তুটগার্ট সম্মেলনে। তা সত্ত্বেও তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন বাস্তবে অপ্রত্যক্ষ।

এই কালপর্যায়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বলয়ে নতুন কোনো উপাদান সংযোজিত হয় নি। সংস্কৃতিকে পৃথকভাবে কোনো কালপর্যায়ের হিসেবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। পূর্বের ধারাপ্রবাহের ক্রমানুবর্তন এবং বিকাশ সাধারণ ধারা।

আমরা এখানে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিমণ্ডলের মধ্যেই আলোচনাকে সীমিত রাখব।

বর্তমান এই কালপর্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিমণ্ডলের বলয়ে উপাদান হিসেবে সংযোজিত হয়েছে শহরকেন্দ্রিক মুৎসুদ্দি সাংস্কৃতিক উপাদান। হাফ-আখড়াই যাত্রা (রাসযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি)। খেউড়, তরজা, টপ্পা, বাঈজী নাচ, বুলবুলির লড়াই পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে পাঁচালি, মনসার গান, নাটযাত্রা বর্তমান। ধ্রুপদী সঙ্গীত সেই উচ্চকোটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

নাটক এবং নাট্যাভিনয় এই কালপর্যায়ে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। প্রায় সাড়ে সাতশো নাটক এই পর্যায়ে লিখিত। জেরাসিম লেবেদেফ (১৭৯৫) থেকে শিশির ভাদুড়ি পর্যন্ত নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে পৌরাণিক, সামাজিক, প্রহসন, ঐতিহাসিক এবং সমকালীন ঘটনা সম্পর্কিত নাটক ও নাট্যাভিনয় একাল পর্যায়ের সম্পদ।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাতে দেশের ইতিহাসের নানান দিক ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত লেখাও একদিক থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা পালন করেছে।

শ্রীরামপুর এবং ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে যা সৃষ্টি তা বৌদ্ধিক স্ফুরণের চাহিদা থেকেই। সেখানে বিদেশী ভাষার অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমেই আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়। এর পাশাপাশি অবশ্য এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে যে বৌদ্ধিক আন্দোলন তা অনেকাংশেই পাশ্চাত্যানুসারী হলেও দেশজ ইতিহাসের গভীর মননকে চিহ্নিত করে।

উপন্যাস, কবিতা, কাব্য, গল্প, ছোটগল্প, প্রবন্ধসাহিত্য বলা যেতে পারে যুগোপযোগী। চিত্রশিল্পের স্ফুরণ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবি বর্মা প্রমুখেরা ব্যক্তিগত চর্চায় একটি নতুন মান প্রতিষ্ঠিত করলেও দেশ জুড়ে আর কোন শক্তিশালী নতুন ধারার প্রবর্তনা স্বীকৃত নয়। বলা যেতে পারে গড়ে ওঠার কোনো পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা যায় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম পটশিল্প। ভাস্কর্যের দিকে সেরকম কোনো উল্লেখ্য নজির নেই।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিমণ্ডলের বলয়ে যে ক্ষেত্রটি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর সেটি হল সংবাদপত্র জগৎ। যে জগৎকে কেন্দ্র করে এই কাল পর্যায়ে বৌদ্ধিক বিকাশ এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছিল, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার সীমাবদ্ধতা থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তুলনায় তা বহু পদক্ষেপের পুরোধা।

তা সত্ত্বেও এই কালপর্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা সবই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানির্ভর। পাশ্চাত্ত্যানুকরণে নিযিক্ত। একালের

দেশপ্রেম পাশ্চাত্ত্য নির্ভরতায় নির্ভরশীল বলেই এক বিশেষ ধরণের সীমাবদ্ধতায় সংকীর্ণ।

কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এ সমস্ত আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই দেশের চাহিদার থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে সমন্বয়ী চিন্তাধারার অনুপস্থিতির জন্য।

এই কালপর্বের প্রত্যেকটি আন্দোলন স্বকীয় স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যে সমান্তরাল। ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিবেদনের স্তরেও সংযোজন, সংশোধন, ভাষার পরিমার্জন ইত্যাদির মধ্যেই তাদের মননশীলতা সীমাবদ্ধ থাকায় কালোপযোগী এবং সমাজ-বিকাশের গতিমুখকে চিহ্নিত করার কাজটি ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হয়েছে। পরিণতিতে একপ্রকার আঞ্চলিকতা সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

যে সংবাদপত্রের নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে সারা ভারত ব্যাপী, শুধু ভারতবর্ষ নয় আন্তর্জাতিক ভাবেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, দেশের জনমতকে দেশের রাজ-নৈতিক জীবনকে সংগঠিত করা যেত, সে ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং খুবই বিচ্ছিন্ন ভাবে বক্তব্য সংগঠিত হয়েছে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনমতকে সর্বভারতীয় করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে দেশের মাটি থেকে, কখনও সে মহারাষ্ট্রীয়, কখনও সে বাংলাদেশের, কখনও দক্ষিণ ভারতের, কখনও পাঞ্জাবের, কখনও শুধুমাত্র আসামের চা বাগিচার।

এই বিচ্ছিন্ন মানসিকতা কি সাধারণ ভাবে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উপরিসৌধ রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ? না দেশজ বৈশিষ্ট্যের সীমাবদ্ধতা?

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সেকাল ও একাল

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯০৪ সাল এক স্মরণীয় বৎসর। এই বছরই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধান রচিত হল। লর্ড কার্জন তখন গভর্ণর জেনারেল। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করত এবং যোগ্য বিদ্যার্থীদের উপাধি দিত। নববিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে বাড়িয়ে দিল। বলল যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করতে হবে,—সেই জ্ঞানকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে,—নতুন প্রজন্মের মধ্যে মৌলিক চিন্তার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সর্বোপরি স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার দায়িত্ব নিতে হবে। নববিধান, তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার পরিব্যাপ্তি ঘটাল। নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্ম-যোগের সূচনা করল।

কিন্তু নব নব ক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞের প্রসারের জন্য চাই সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী। ভারত সরকার এই নিয়মাবলি রচনার দায়িত্ব দিলেন পেড্‌লারকে। পেড্‌লার কোল্‌কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি সমিতির ওপর বিস্তৃত সংবিধান রচনার ভার পড়ল। সময় দেওয়া হল দু'বছর, কিন্তু, সিণ্ডিকেট নিয়মাবলী রচনা করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে পেড্‌লারের কার্যকাল শেষ হল। আশুতোষ উপাচার্যের কার্যভার গ্রহণ করলেন। সরকারও উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করে তার ওপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব দিলেন। অল্প সময়েই সংবিধান রচিত হল। কোল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যধারার আমূল পরিবর্তন ঘটল।

আশুতোষের নেতৃত্বে সমিতি যে সংবিধান রচনা করলেন তার মূল বিষয়গুলি ছিল ঃ

(ক) স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পাঠক্রম পরিচালিত হবে মহাবিদ্যালয়ে। বিশ্ব-বিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠন-পাঠনের এবং গবেষণার দায়িত্ব নিতে হবে।

(খ) মহাবিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা বিশ্ব-বিদ্যালয়কেই দেখতে হবে। উন্নত গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাবতীয় নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আসবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন এবং উন্নত পর্যায়ের পঠন-পাঠনের ও গবেষণার ব্যবস্থা করবেন। জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মেষিত করতে হবে। দেশের সর্বোৎকৃষ্ট মনের মিলন ঘটিয়ে নব নব জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্র ও পরিবেশ রচনা করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যার্থীদের মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও বিকাশ ঘটাতে হবে। এ সম্বন্ধে নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের।

(ঙ) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি রক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে যে কোনো বিদ্যার্থী একটি পর্যায়ের পাঠক্রম শেষ করে আর একটি পর্যায়ে প্রবেশ করে তার সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আশুতোষের নেতৃত্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই এই নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করল। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিই এভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। স্যার আশুতোষ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অধ্যাপক পদে বরণ করলেন। বহু মনের মিলনক্ষেত্রে যথার্থ জ্ঞানের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হতে লাগল। এরই মধ্যে হার্ডিঞ্জ গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন। তাঁর আনুকূল্যে সরকারী অনুদান এল। অর্থনীতি, গণিত ও দর্শনের অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হল। গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার সমৃদ্ধ হল। নতুন ছাত্রাবাস ভবন নির্মিত হল। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের অর্থানুকূল্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পঠন-পাঠনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মসাফল্যের মুহূর্ত্তে সরকারী আনুকূল্যের গতি স্তিমিত হয়ে এল। আশুতোষের কার্যকাল ও শেষ হল। সরকারী ঔদাসীন্যের কারণটি, কিন্তু, অজ্ঞাত রইল না। পূর্ববাংলার সিরাজগঞ্জের কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল। বাংলা প্রদেশের তদানীন্তন লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট্‌ গভর্ণর ব্যাম্পফিল্ড্‌ ফুলার বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করলেন,—ঐ বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আশুতোষ এই অনুরোধকে অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে করলেন। গভর্ণর জেনারেল মিন্টোকে জানালেন, এ-অনুরোধ রক্ষা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। মিন্টোই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। আচার্য উপাচার্যের মতে মত দিলেন। ক্ষুব্ধ ফুলার পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। তা গৃহীতও হল। সরকারের সঙ্গে সংঘাতে বিশ্ববিদ্যালয় জয়ী হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার এবং স্বাতন্ত্রের ভিত্তিভূমি এইভাবেই আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই জয়, কিন্তু নিতান্ত সাময়িক। সব আচার্য মিন্টো ও হার্ডিঞ্জের মত নন। সরকারী আনুকূল্যের উৎসমুখ, তাই, শুষ্ক হয়ে যেতে সময় লাগল না। ইতিমধ্যে স্যার আশুতোষের কার্যকাল শেষ হল। তাঁর উত্তরসূরি দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর কার্যকালেও সরকারী আনুকূল্য মিলল না। ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংকট এত তীব্র হল যে আচার্যের অনুরোধে ভারত সরকার স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের বিকাশ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করার জন্য দুটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠিত হল,—নতুন কয়েকটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হল এবং কিছুটা অনুদানের আশ্বাস মিলল।

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন চালু হবার পর আবার অর্থসংকট প্রকট হল। ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব বঙ্গপ্রদেশের সরকারের ওপর দিলেন, কিন্তু কোনো অর্থবরাদ্দ করলেন না। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল। এর মধ্যেই রোনাল্ডসে সার আশুতোষকে আবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেবার জন্য আহ্বান করলেন। স্বয়ংশাসিত সংস্থা রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার আশ্বাস দিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করে তোলার এই সুবর্ণ সুযোগ ভেবে আশুতোষ উপাচার্য পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু রোনাল্ডসের প্রতিশ্রুতি তো রক্ষিত হলই না। পক্ষান্তরে অন্য বিপত্তি ঘটল।

নবগঠিত বিধান সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে 'দণ্ডনীয় চিন্তাহীনতা' এবং 'চিন্তাহীন বিস্তারের' অভিযোগ আনলেন। এতে নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী শ্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ও সরকারী ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দেবার জন্য

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সমিতি গঠন করলেন। সমিতি সরকারের অভিযোগকে তীব্র ভাবে খণ্ডন করলেন। এরই মধ্যে সরকার ঘোষণা করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে, কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে। প্রথম সর্ত হচ্ছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়কে প্রতি মাসে সরকারের কাছে খরচের হিসাব দিতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত হচ্ছে, সরকারের অগ্রিম অনুমোদন ব্যতীত উন্নয়নের বা বিস্তারের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলবে না। সিণ্ডিকেট ক্ষুব্ধ হলেন। অপমানিত বোধ করলেন। সরকারের অনুদান প্রত্যাখ্যাত হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিক্ষামন্ত্রীর বহু বিঘোষিত নীতিটিও শাসক-কুলকে জানিয়ে দেওয়া হল। এই সময়ই অকসফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন কুড়িয়ে ব্রিটিশ শিক্ষামন্ত্রী ফিসার বলেছিলেনঃ—

"No one appreciates more fully than myself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of the Universities the State is, in my opinion, not competent to direct the work of education, and disinterested research which is carried on by Unversities, and the responsibility for its conduct must rest solely with their Governing Bodies and Teachers . This is a principle, which has always been observed in the distribution of the funds which Parliament has voted for subsidising university work; and so long as I have any hand in shaping the national system of education, I intend to observe this principle."

সিণ্ডিকেট জানিয়ে দিলেন যে, ভারত সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নীতি ব্রিটিশ সরকারের বিঘোষিত নীতির পরিপন্থী।

১৯২৩ সালে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাকে আরও খর্ব করার চেষ্টা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিল আইন-সভায় উত্থাপিত হল। বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারবহির্ভূত করার উদ্দেশ্যেও একটি বিল এল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সিদ্ধান্তে মন্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দিতে চাওয়া হল। আশুতোষ বলেন, জনমত সংগ্রহ না করে বিলগুলি গ্রহণ করলে ও আইনে রূপান্তরিত করলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়ই আসবে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পত্র-বিনিময়েই বহু সময় কেটে গেল। ইতিমধ্যে আশুতোষের পঞ্চম কার্যকালও শেষ হল।

লিটন্ এর মধ্যে আচার্য ও রাজ্যপাল হয়েছেন। লিটন্ ভাবলেন, আশুতোষকে ষষ্ঠ বারের জন্য উপাচার্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোধহয় তাঁর সমর্থন পাওয়া যাবে। তিনি লিখলেন,—আশুতোষ লিটন্ ও তাঁর সরকারকে কোনো সাহায্যই করেন নি এখন যদি তিনি সাহায্যের আশ্বাস দেন, তা হলে সরকার তাঁকে আবার উপাচার্যের দায়িত্ব দেবেন। আশুতোষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। লিটনের আস্থাভাজন ভূপেন্দ্রনাথ বসু উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট কিন্তু কাটল না। অর্থকৃচ্ছতা ও নববিধানের সংকট,—এই দুয়ের আবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই গেল। ইতিমধ্যে ১৯২৪-এর মে মাসে স্যার আশুতোষের তিরোধান নিদারুন শূন্যতার সৃষ্টি করল। লিটনের মত ঘোর আশুতোষ-বিরোধীকেও স্বীকার করতে হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ আদর্শের শাশ্বত রূপকার আশুতোষঃ ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় নীতির তিনিই প্রবর্তক।

সেকালে সরকার কোনো শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন নি। তবে আশুতোষ তাঁর বিভিন্ন সমাবর্তন-ভাষণে ও মন্তব্যে যে শিক্ষা-চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। উত্তর-স্বাধীনতাপর্বের আধুনিকতম শিক্ষা-নীতিও তার কাছে ম্লান ও নিষ্প্রভ। আশুতোষ মনে করতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন মানুষ গড়ে তোলা যে মানুষ সমাজের কল্যাণে নিজের অর্জিত বিদ্যা, শ্রম ও বিত্ত ব্যয় করতে পারবে। এ-রকম মানুষই ত' হবে জাতির সম্পদ। তাই কেবলমাত্র কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান জন্মে দিলেই হবে না। শিক্ষা বিদ্যার্থীর আত্মবলিদানের উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করে দেবে। এতেই শিক্ষার চরিতার্থতা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে গেলে শিক্ষাকে নিম্নের নীতিগুলি মেনে নিয়েই নিজের প্রসার ঘটাতে হবে।

(ক) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অন্যের পরিপূরক। তাই পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে সুবিন্যস্ত স্তরকে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ে উজ্জ্বলতর হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই পরিণতি লাভ করবে।

(খ) শিক্ষা জলের ন্যায় নিম্নগামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হলে সমাজে পরিব্যাপ্ত হবে। সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটবে।

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-নির্ধারণের ভার শিক্ষাবিদ্‌দের ওপরই দিতে হবে। এঁদের স্বাধীন চিন্তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারবে।

(ঘ) সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন ভাবে হস্তক্ষেপ করবেন না। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক হবে গভীর আস্থা ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির স্থান নেই। বিদ্যার্থী প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন না। তেমনই শিক্ষকও হবেন রাজনীতি-প্রভাবমুক্ত। যে শিক্ষক প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাঁর পক্ষে উজ্জ্বল আদর্শকে প্রতিফলিত করা বা ছাত্রদের মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সংক্রমিত করা সম্ভব নয়।

(চ) পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করতেই হবে। প্রচলিত পদ্ধতি ছাত্রদের মনে পরীক্ষা-ভীতিকেই বাড়িয়ে দেয়। মনকে সংকুচিত করে। তাই প্রশ্ন হবে সরল। উত্তর-পত্রের মূল্যায়নও হবে সহজ। প্রশ্ন কঠিন করে বা কম নম্বর দিয়ে শিক্ষার মান বাড়ানো যায় না। তাকে বাড়াতে গেলে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়।

(ছ) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরস্পর সম্পৃক্ত। গবেষণার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতেই হবে। যে প্রতিষ্ঠানে নতুন জ্ঞানার্জনের ও গবেষণার ব্যবস্থা নেই, তা' বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মর্যাদালাভের যোগ্য নয়।

আশুতোষই হচ্ছেন ত্রিভাষা-সূত্রের প্রথম প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন, ইংরাজী, মাতৃভাষা এবং একটি প্রাচীন ভাষা, যেমন সংস্কৃত বা আরবী প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে জানতেই হবে। ইংরাজী ভাষায় অধিকার না থাকলে বিদার্থী পরবর্তীকালে বহির্বিশ্বের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। ফলে কূপমণ্ডূকের মানসিকতা তাঁকে গ্রাস করবে। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার প্রধান বাহন। আর সংস্কৃত বা আরবী ঐতিহ্য এবং পরম্পরার বিরাট ভাণ্ডার তাঁর কাছে উন্মুক্ত করে দেবে। এ-ভাবে তিনটি ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করার পর নির্দিষ্ট পাঠক্রমে শিক্ষা গ্রহণ করে স্নাতক মানব সম্পদে পরিণত হবে।

এ-ভাবেই আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুললেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মনীষীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পঠন-পাঠনও গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। বিশ্বের মনের মিলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বাস্তবায়িত হল ঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় সার্থকনামা হয়ে দেশকে আলোকের সন্ধান দিতে লাগল।

আশুতোষ সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে বা সরকারী সমালোচনায় বিচলিত না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কাঠামো গড়ে তুললেন তাই পরবর্তীকালে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির আদর্শ হয়ে রইল।

১৯২৪-এর ২৫শে মে, আশুতোষের মৃত্যু হল। রাজ্যপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তখন লিটন্। ঘোর আশুতোষ-বিরোধী। তিনিও কিন্তু স্যার আশুতোষের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আশুতোষ বলে মন্তব্য করলেন এবং বললেন ঃ

We have assembled under the shadow of a great disaster, we stand in the presence of death, and with bowed heads and heavy hearts we have come to mourn the loss of our university's greatest son....Sir Asutosh Mukherjee was the most striking and representative Bengali of his time. ....The University of Calcutta, as it stands to day, bears the indelible impress of his 35 years of devoted labour. What the university is to-day is the result of Sir Asutosh Mukherjee's work.....The Post-Graduate Department of this university was the outstanding product of Sir Asutosh's great career.....For many years, Sir Asutosh was in fact the university, and the university Sir Asutosh.....This was the work nearest his heart, the work on which he spent his energies to the very limit of his endurance, and what worthier memorial to his memory can we conceive than an endowment of that Post-Graduate Department which he created. Let each one of us severally resolve that this cherished creation of his life shall not suffer because he has left us....Let that foundation-stone of that temple of reconciliation be a joint and common purpose to receive the teaching University of Calcutta as a sacred trust from his dying hands, and in the years to come, whatever changes may be found essential to the general organisation of the University, to allow nothing to threaten its stability, its prosperity, its freedom, or its future development.

স্যার আশুতোষের তিরোধান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সমাজের সর্বক্ষেত্রে সরকারের একাধিপত্যের উগ্র সমর্থক লিটন্কেও সচেতন করে দিল।

দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধি-কারের সেই চেতনা হারিয়েছি। সরকারী হস্তক্ষেপের মাত্রা বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারী অনুদানের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল হওয়ায় সঙ্গত কারণেই সরকার তার ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অনেকক্ষেত্রেই অসহায় বোধ করছেন। শুধু তাই নয়, সরকার শিক্ষানীতিও নির্ধারণ করতে চাইছেন। ভাবছেন, কোন্ পর্যায়ে কি পড়ান হবে, ক'টি ভাষা আবশ্যিক হবে, সাহিত্য না ভাষা কোন্‌টি গুরুত্ব পাবে,—এ-সব বিষয়েও যেন তাঁদের বক্তব্য আছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার-হরণে আরও অনেকের অবদান আছে। আগে শিক্ষা-দান এবং গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের সিংহভাগ ব্যয়িত হতঃ অল্পই খরচ হত প্রশাসনে। এখনকার চিত্র বিপরীত। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রশাসনের ব্যয় এবং পঠন-পাঠন-গবেষণার ব্যয় সমান সমান হয়ে উঠেছে। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে যেখানে গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের জন্য নির্দিষ্ট অনুদান প্রশাসন খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। প্রশাসন পঠন-পাঠন-গবেষণার চেয়ে বেশী গুরুত্ব পাওয়ায় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীরা স্বভাবতঃই অধ্যাপককুলের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। শিক্ষার নীতি নির্ধারণে এবং তার বাস্তবায়নে শিক্ষা-বিদ্‌দের চেয়ে শিক্ষাকর্মীদের মতামতই গুরুত্ব পাচ্ছে। বিদ্যার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বৃহৎ অংশ বলে বিদ্যার্থীদের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। তবে এক্ষেত্রেও মর্যাদা লঙ্ঘন করলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। পাঠক্রম-নির্ধারণ, অধ্যাপক-নিয়োগ, ভর্তির নীতি-নির্ধারণ, পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার, এ-সব বিষয়ে ছাত্রদের মতামত নিতে গেলে অনেক সময়ই ঐকমত্যে পৌঁছোনো যায় না। আজকাল বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরাই ছাত্র-ভর্তির ব্যবস্থা করেন। মেধার চেয়ে গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য স্বভাবতঃই প্রাধান্য পায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রসারিত করায় অধিকাংশ বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছে। তা'ছাড়া প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই বেশ কিছু ক্ষমতাশালী চক্রের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন। উপাচার্য বা অধ্যাপক গোষ্ঠীর অধিকাংশ মতামতই অগ্রাহ্য হয়। এ-ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার আজ ধূলিলুণ্ঠিত।

স্যর আশুতোষের সময় আচার্যেরাও উপাচার্যকে সমীহ করতেন,—অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। রাজ্যপালের সঙ্গে উপাচার্যের মতভেদ হলে বড়লাট আশুতোষের মতকেই গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল পদত্যাগ করলে তাও গৃহীত হয়। তখন সরকারের ধারণা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় সর্ববিধ শিক্ষার নিয়ামক। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না করলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই বিঘ্নিত হবে। এ-ধারণা আজ আর নেই। সরকারী অনুদানের অঙ্ক বাড়াবার জন্য উপাচার্যকে শিক্ষা-সচিব এবং তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের ঘরে প্রায়ই হাঁটাহাঁটি করতে হয়। শিক্ষাসচিবের কটূক্তি শুনতে হয়। শিক্ষাবিদ্‌দেরও শিক্ষা-বিভাগের আধিকারিকদের অপমান সহ্য করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদের কে কটি ক্লাশ নিচ্ছেন, তাও সরকারকে জানাতে হয়। অধ্যাপকদের মর্যাদা যেখানে রক্ষিত হয় না, সেখানে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি কতখানি হতে পারে, তা বিবেচ্য।

উপাচার্যদের অবস্থা যে কত করুণ ও শোচনীয় হয়েছে, তা' বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিক্ষাকর্মী ও বিদ্যার্থীদের দাবী-দাওয়ার বিবেচনা তাঁর সব সময়টাই নিয়ে নেয়। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটাবার জন্য কোনো

পরিকল্পনাই তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। এর ওপর সরকারের হাতেও লাঞ্ছনার শেষ নেই। অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহের ওপরই তাঁর কার্যকাল নির্ভর করে।

কিছু কিছু রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্যেরও পরিবর্তন ঘটানো হয়। এক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন ঘটল। রাজ্যপাল ও আচার্য রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। উপাচার্যেরা খুশি। নৈশভোজে আপ্যায়নের উষ্ণতা তাঁদের মুগ্ধ করল। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল, দুইই বিনয়ভারে নম্র। এ-অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। পরের অভিজ্ঞতা করুণ। ভোজের শেষে উপাচার্যেরা যখন প্রস্থানোদ্যত, তখন আচার্যের দপ্তর তাঁদের হাতে একটি করে মুখবন্ধ খাম তুলে দিলেন। গাড়ীতে এসে খাম খুলে উপাচার্যেরা বিস্মিত। রাজ্যপাল-আচার্য প্রসন্ন চিত্তে তাঁদের কার্যকালের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। নতুন উপাচার্যও নিযুক্ত করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইনে অবশ্য এ-রকম একটি ধারা আছে যে রাজ্যপাল-আচার্যের প্রসন্নতার ওপরই উপাচার্যের কার্যকাল নির্ভর করছে।

আর একটি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়। এক সর্বভারতীয় যুব নেতার সহধর্মিণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি বিভাগে কর্মরতা। নেতা চান,—পত্নীর পদোন্নতি ঘটানো হোক্। উপাচার্যের ওপর চাপ দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু উপাচার্য ত' ইচ্ছা করলেই কিছু করতে পারেন না। তাঁকেও অন্যের মতামত নিতে হয়। ফলে নেতাদের ঈপ্সিত-পূরণে বিলম্ব ঘটতে লাগল। হঠাৎ রাজভবন থেকে উপাচার্যের আমন্ত্রণ এল। আচার্য বললেন,—সরকার উপাচার্যের কাজকর্মে বিরক্ত। তিনি যেন অবিলম্বে পদত্যাগ করেন। না হলে বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় আইন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে নতুন উপাচার্যের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হবে। সাতদিনের মাথায় তাই ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয় অধিগৃহীত হল। উপাচার্যের পদচ্যুতি ঘটল। এ-ক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে নাকি নিজের অসহায় অবস্থার কথা খোলাখুলি বলেছিলেন। বলেছিলেন—যাঁরা রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এবং যাঁদের প্রসন্নতার ওপর রাজ্যপালের কার্যকাল নির্ভর করে তাঁদের নির্দেশেই নাকি তাঁকে এই অপ্রিয় কার্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যাই হোক্, ফলশ্রুতি একই—উপাচার্যের পদচ্যুতি ও মর্যাদাহানি।

অন্য একটি রাজ্য। উপাচার্য রাজনৈতিক নেতা। পূর্বে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এখন রাজ্যে স্বভাবতঃই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী উপাচার্য। রাজ্যে পালাবদল ঘটল। নতুন দল মন্ত্রিসভা গঠন করল। উপাচার্য আশঙ্কা করলেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন। হাইকোর্ট উপাচার্যের আবেদন মঞ্জুর করে বলুলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যে পরিবর্তনই ঘটানো হোক না কেন তা ক্ষমতাসীন উপাচার্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ এই উপাচার্যকে নিয়োগ করা হয়েছিল পূর্বের আইন অনুসারে।

হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ দূরে। সন্ধ্যায় উপাচার্য তাঁর সরকারী আবাসে এসে দেখলেন,—একটি সরকারী নির্দেশ তাঁর প্রতীক্ষারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলে উপাচার্যের কার্যকালের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন। তার জন্য তিন মাস পূর্বে জানাতে হবে বা তিন মাসের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হবে। এই উপাচার্যের

ক্ষেত্রে তিন মাসের বেতন দিয়ে সরকার তাঁর কার্যকালের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। উপাচার্যের স্থলাভিষিক্ত নতুন প্রশাসকের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। পরের দিনই উপাচার্য আবার হাইকোর্টে গিয়ে কোর্টের অবমাননার কথা জানালেন। এতে হিতে বিপরীত হল। রাত্রে উপাচার্যের বাসভবন বে-আইনী ভাবে অধিকার করে রাখার অপরাধে উপাচার্যকে গ্রেপ্তার করে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। এই ভাবেই উপাচার্যের উপাচার্য-জীবনের সাময়িক বিরতি ঘটল। এই উপাচার্যকে উপাচার্য-পদ ফিরে পাবার জন্য রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এই হচ্ছে আজকের বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্যের মর্যাদা। একদিকে শিক্ষাবিদ্ ও অধ্যাপকদের মর্যাদার অবক্ষয় ঘটছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাজের প্রত্যাশা বাড়ছে। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জ্ঞানসৃষ্টি বা সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র নয়ঃ এ হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের শক্তিশালী অস্ত্র। আজকের ভ্রষ্টাদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কি জাতীয় উন্নয়নে সার্থক ভূমিকা পালন করে সমাজের সেই প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পারবে?

Urbanism and Class Formation in 19th Century Calcutta

Pradip Sinha

The metropolitan 'middle class' in Bengal furnished the most remarkable example of the operation of education as a force in the formation of a community. The force underlies both the triumph and the failure of the Bengali in the 19th century. The radiation of this force from the metropolis outwards into the interior of Bengal created a striking homogeneity of outlook.

The peculiar strength of the force of education in 19th century Bengal finds experession in some of the testamentary documents of early 19th century. Rajmohan Sein of the famous banker family of Seins (the banking house of Mathuramohan Sein) in early Calcutta writes in his will not about the revival of the great banking tradition of the family (the house fell a victim to a speculative crisis in early 19th century) but of the future education of his children.

"Further, when eldest son begins to attend the English college to study, he will get 'sicca' twenty seven rupees for the expenses of his studies including the hire for his 'palankeen'. Further, when my second son begins to study English, he will get at the rate of 'sicca' ten rupees per month for the expenses of his studies. The 'palankeen' that is retained for my eldest son he will use that 'palankeen' and when my third son that attend to study English, then set aside the arrangements mentioned above, for the purpose of these three going together to their studies, my executors will purchase and provide them with a palankeen carriage and a horse for the sum of three or four hundred rupees, and paying at the rate of sicca twenty two rupees per month for the said vehicle—as long as my sons attain not severally the age of sixteen years, paying for the expenses of their education at the rate of sicca ten rupees per month, they will get my sons educated."

In another testament dated 1883 Brojonath Mitra instructs his sons:

"You will defray the annual expenses of the Issore Sarodeea Poojah, etcetra, and charges for food and clothing of everybody and the monthly wages of the Persian Tutor, the School Master and the Gooroo Mahashaya and provide for the requisites for writing and pay the expenses of my residence in Benares. . . . My mercantile business that is carried on in Dhurmotollah you two persons will carry on that, if any loss occurs, you will see the result for two or three years and then give it up." (A detailed schedule of lands and houses bought by Brojonath, the wine merchant,

around Calcutta is attached to the testamentary document).

History often fails to find adequate documentary material to illustrate even a pervasive social attitude. Such an attitude is taken for granted by the generation under its influence and later generations are deprived of concrete facts for illustration of many of the unspoken but basic beliefs of the past. The two wills cited above are thus of special value. The singular attachment of the Bengali Bhadralok to education stood for an attitude that tended to infiltrate downwards, notably into some higher artisan castes and the well-to-do peasants. This probably tended to create gaps in the Bengali artisan community, notably in Calcutta. An employer speaks of Bengali carpenters with sons educated upto the matriculation or F.A. level, looking for 'decent' employment.

The 'Bhadralok' was in no sense an exclusive product of the 19th century. But the 19th century may be said to have done almost the same thing to him that the Victorian age did to the English middle class. In the peculiar social evolution of Bengal, 'Bahdralok' meant primarily the high caste Hindu gentry of Bengal and was applied to other sections of society, or rather to individuals and persons belonging to those sections only by analogy. Here there is a broad qualitative difference from the western concept of middle class. The second point of difference is more quantitative. The great bulk of the Bengali 'bhadralok' partook of the character of the rural gentry. The nineteenth century had been adding some new dimensions to the phenomenon of 'bhadralok', a new middle class dimension being represented by professional men like lawyers and doctors. Pressure on land or ancestral acres might have been creating a kind of 'agrarian crisis' for the Bengali gentry, strengthening the process of migration to the towns or the metropolis. But the major component element of 'bhadralok' community still remained rural.

In the metropolis, the Bengali middle class had no real working class or even labouring class base, spontaneously developing from Bengali society. The pattern of migration of workers or labourers to Bengal's metropolis shows the essentially weak trend of migration of working population from Bengal districts. The metropolis or rather the metropolitan complex of Bengal, did not become an area where any significant degree of communication could develop between the component parts of its population. The absence of a large and substantial Bengali working class, which could indeed develop, given the requisite degree of migration from rural Bengal, even within the limited industrial complex of the late 19th century, appears to have had a certain etiolating effect on the Bengali middle class. This was particularly evident in the great bulk of the 'bhadrolok' community which had become indigenous to Calcutta and its neighbourhood.

The labouring class base of the metropolitan society had from the inception of the metropolis been influenced by the peculiar nature of migration to the city. Even as early as the late 18th century the palanquin

bearers of Calcutta were almost all natives of Orissa. In the large domestic service base of the metropolitan society (110,000 or nearly 1/8th of the inhabitants in 1901) the migration of 'Chasi Kaibartas' (cultivators) from Bengal districts constituted a significant element, but that did not counter the striking disparity in the industrial sector created by the singular weakness of the trend of migration from Bengal districts to the growing industrial areas in and around Calcutta. The growth of the industrial town of Howrah from a congeries of villages in mid-19th century was due almost entirely to migration from Bihar and U.P. Nearly half the inhabitants of Howrah in 1911 were born in the U.P. or the Province of Bihar and Orissa and only 45% spoke Bengali, while 47% spoke Hindi and 3% Oriya. The growth of mill towns in the 24-Parganas similarly owed little to migration from Bengal districts. In Bhatpara (1911) four persons spoke Hindi to each person speaking Bengali, in Titagarh 75% spoke Hindi while 11% spoke Bengali. On a rough calculation 'in most mills two-thirds of the hands were composed of up-countrymen'. In Titagarh, a significant proportion of mill labourers came from the Telegu-speaking region.

The pattern of migration from suburban districts to the metropolis proper does not show any marked tendency on the part of artisans and labouring classes towards migration. The largest single unit of migrants from the suburban districts was composed of high caste people who may be said to have belonged to the class of 'bhadrolok' or gentry. From Bihar and U. P. the migration was almost wholly of labouring castes. The most important element was represented by the Chamars. Almost all the shoemakers and cobblers as also a very large proportion of mill labour were men of this caste. Some of the professional and artisan castes of Bengal similarly failed to supply the metropolitan demand as also the demand in the interior of Bengal, mostly in the cases of washermen and milkmen.

The metropolitan society as a centre of social change thus had some fundamental drawbacks, derived mainly from the character of the Bengali middle class. Yet the logic of urbanism had worked on certain levels to modify the original rural tradition. A noticeable change had occured so far as commensality was concerned.

The traditional rules of commensality appear to have been first broken by young Bengal. Dwarakanath Tagore, in the early stage of his association with the English, refrained from dining with them in his own home. Later, when he changed the practice, he had to live in a certain degree of isolation from his family, and his touch was considered to have been ritually impure. In the later decades of the nineteenth century ritualistic and caste restrictions on commensality had almost spontaneously disappeared among educated Bengalis of the metropolis. Digambar Mitra, a highly educated leader of the metropolitan society, freely dined with Muhamadans, Christians and Hindus, who had returned from England. Justice Dwarakanath Mitra dined with the Governor-General and European

officials. An interesting description of student messes in the seventies of the nineteenth century shows the extent of change in the matter of commensality even among young men from interior Bengal who had been pursuing their studies in Calcutta. They had organised their own district messes, like the Tippera mess, the Barisal mess and the Bikrampur mess. "We were a rather mixed lot," comments the writer in describing the Sylhet mess. "Some were orthodox Hindus, though their orthodoxy did not go so far as to prohibit association or interdining provided the food was cooked by a Brahmin, with those who did not observe the rules of caste. Others were absolutely heterodox and openly violated all the rules of Hinduism in regard to eating and drinking." In a book published by the Standing Committee on the Sea-voyage Question (1894), the promoters refer to the general practice among educated Bengali to ignore caste restrictions on food, drink and interdining.

In rural Bengal restrictions regarding commensality appear to have held ground. The same individual perhaps followed two different lines of behaviour in respect of food and interdining—a heterodox line in the city or town was not perhaps very difficult to reconcile with the acceptance of orthodox norms in one's native village. A tremendous controversy raged through the rural district of Dacca over the question of excommunicating a group of high caste young men who had taken food from the hands of Muhamadans while travelling on a steamer. Surendranath Banerji's family was excommunicated in his native village after his return from England, mainly under a general assumption that Surendranath had not maintained orthodox caste rules regarding food and interdining. Both these cases, occurring in early seventies, might have been somewhat extreme. Yet they serve to show that even in the seventies rural Bengal still attached great importannce to these matters while in urban Bengal the attiude was generally one of connivance. Excommunication, the most effective sanction of traditional society against recalcitrants, tended to lose much of its rigour in metropolitan society.

Yet even in the matter of commensality, urban Bengal was subject to the dichotomy between the male and the female world, which perhaps underlies the whole social development of the nineteenth century. While a considerable degree of freedom had come to characterise urban male behaviour, the inner apartments of the Bengali houshold continued to maintain firm links with rural tradition The Brahmo families could overcome this dualism in varying degrees but only in a very limited sphere of society. The social freedom of women appears to have been greater in western and southern India than in Bengal. Bipin Pal, a keen observer of 19th century social scene, writes about this in his *Memories*: "Female education and the freedom of social intercourse and movement of Mahratta ladies was a new and inspiring experience which I had in Bombay. Both the Parsis and the Mahrattas did not observe the *zenana* seclusion or the *purdah* which is universal among higher class Hindus and Muslims in

Bengal and Upper India." This was due to an indigenous tradition which Bipin Pal deeply appreciated. In Bengal, however, the spectacle of leading reformers or public men taking *prayaschitta* or penance for offence against caste orthodoxy was unthinkable; not so in Maharashtra where Gopal Hari Deshmukh, for all his avowed antipathy to priestly influence, had to submit to a penance for attending the marriage ceremony of a widow, and Ranade was forced to do the same thing for attending in 1891, a tea party given by Christian missionaries.

The metropolitan society may thus be said to have responded to some new pressures and forces of urbanization, which tended to acquire many peculiarities following mainly from rural or traditional pull on urban society. So far as the physical growth of Calcutta is concerned the city had made rapid strides in area and population. The early population estimates are not quite reliable but they are of interest in indicating a trend towards growth. The writer of *A Short History of Calcutta* comments, after a comparative study of figures, that the actual population of the settlement in 1710 was not more than 10,000 to 12,000 souls. He describes this figure as an 'approximate guess'. A reasonably acceptable figure from a later date is the figure of population arrived at the Police Census of 1837. The figure was 229,714. At the official census in 1876, the figure was 409,036. In 1901, the official census estimate was at 562,686. During the late 19th century the growth of town area and houses took to the following pattern :—

	Town area in acreage			Houses	
	Urban	Rural	Total	Pucka	Kutcha
1876	3,754	1,283	5,037	16,896	22,860
1881	3,754	1,283	5,037	15,128	19,406
1891	11,850	1,283	13,133	26,070	47,351
1901	11,954	1,283	13,237	40,342	79,027

Thus even the Town Proper, as distinguished from the Suburbs, had a quite identifiable rural acreage. The rural character was naturally more pronounced in the suburbs. As regards the sub-metropolitan districts of the 24-Parganas, Howrah, Hughly and Nadia, they had been exposed to the process of physical change in certain pockets, though the intensely agrarian character of the hinterland neutralized the social impact of industrialism to a point where it loses much of its significance for contemporary Bengali society. The pattern of migration to these industrial centres, among other things, shows the weakness of Bengal's response to this force.

সাহিত্য, ফোকলোর এবং গণসংযোগের সমস্যা

ক্ষেত্র গুপ্ত

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।...
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
—রবীন্দ্রনাথ।

সংযোগ একটি আধুনিক সমস্যা। এবং পাঠকদের কাছে নিবেদন—সংযোগ শব্দ আমি কমিউনিকেশনের বাংলা হিসেবে ব্যবহার করেছি, মাস কমিউনিকেশনের বাংলা ধরে নিয়েছি গণ-সংযোগ। জানিনা পরিভাষা রূপে শব্দটি এখনও যোগ্য বিবেচিত হয়েছে কিনা। ব্যাপক সচেতন ভাবনায় আধুনিক কালে, বলা যায় সম্প্রতি বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। উপগ্রহ ও মাইক্রোওয়েভ সংযোগ সংক্রান্ত আবিষ্কার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সদ্যই বিপ্লব ঘটিয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সমস্যাটি একান্তই আধুনিক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্রতি শিল্পীকে চিরকাল এর সমাধান খুঁজতে হয়েছে। অস্পষ্ট সামাজিক ভাবনা হিসেবে প্রশ্নটি আমাদের দেশেও ক্বচিৎ উচ্চারিত হয়েছে। তবুও সংযোগ-সমস্যা বিশেষভাবে একালের জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক সমাধান দেশ-নিরপেক্ষ। একদেশ থেকে দেশান্তরে তার আমদানি-রপ্তানি সহজেই ঘটছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংযোগের সমস্যা প্রতি দেশ ও জাতির নিজস্ব। প্রশ্নগুলির উত্তর প্রত্যেককে নিজের মতো করেই পেতে হবে।

লোকায়ত শিল্প-সাহিত্য-নাট্যাদি কিভাবে সংযোগ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল, অথবা সেখানে কেন সংযোগ কোনো সমস্যা হয়ে ওঠে নি, তার বিচার-ব্যাখ্যা করতে বসে প্রথমেই ভাবা দরকার কোথায় দাঁড়িয়ে সে বিশ্লেষণ। সংযোগের যে সব দিক একালে নানা-ভাবে সত্য তার মধ্যে অবস্থান আমাদের। এই দেখা হয়ত বাতায়নিকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের কাছে লোকায়ত সংস্কৃতি দূরে দাঁড়িয়ে দেখবার, আলোচনার-গবেষণার বস্তু। আমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে একজন বাউল গায়ক, ছো-নর্তক কিংবা সত্যপীরের কিসসার দোহার হতাম অথবা হতাম কোন গ্রামীণ, যাদের মধ্যে এদের জন্ম ও বিস্তার, তাহলে বিষয়টিকে ঠিক এভাবে দেখতাম কিনা বলতে পারব না। কিন্তু এই চিন্তা আমাকে সংশয়মূঢ় করে না। আমার চিন্তা আমারই। যদিও ভেতর দিক থেকে ব্যাখ্যা হলে তা কি রকম হত তা জানতে আমি আগ্রহী এবং তাকে দাম দিতেও।

● ১. মান এবং জনসাধারণ

আমরা একালের মানুষেরা নিয়ত বিচ্ছিন্নতায় ভুগি এবং প্রতিক্ষণ সংযোগের সাধনা করি, সংযোগের স্বপ্ন দেখি। আমাদের সাহিত্য যতই আধুনিক হচ্ছে, জটিল ও বিচিত্র হচ্ছে, ততই জনগণ দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা সেতুবন্ধন চাই সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্য—একটা সভ্যতার পুঞ্জিত এই প্রকাশ যেন মুছে না যায়১। আমাদের নাটক যত বুদ্ধিদীপ্ত

ও চতুর হচ্ছে, গ্রুপ থিয়েটারের সংখ্যা বাড়ছে যত, তার সারা গায়ে মার্জিত দ্যুতি--তার দূরত্ব জনসাধারণ থেকে আরও দুস্তর হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, এরা জনসাধারণের, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের দুঃখদুর্দশার কথা, সংগ্রামের কথা বলে। অথচ মোটা দাগের ব্যবসায়িক থিয়েটারের চারপাশে ভিড় জমানো শহুরে মানুষজন থেকেও এই নাটক দূরবর্তী। সাহিত্য শিল্পের জগতে মান যত বাড়ে, ততই কি বাড়ে এই বিচ্ছিন্নতাও? কাজ যত সূক্ষ্ম হয়, তা কি আরও কম—আরও কম মানুষের অধিকারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে? যাঁরা বাজারে বিকোন না তারা এবং যাঁরা বাজারে বিকোতে চান না তাদের কেউ নাক উঁচিয়ে বলেন, খুব কম আমার নিমন্ত্রণ, কিন্তু অনেক যত্নে বাছাই করা। এদেশের গণতান্ত্রিকতা এ-ধরণের আভিজাত্যের লুব্ধ পূজারী।

আজকাল যে যাত্রাভিনয়, শুনেছি তা ভালো ইন্ড্রাস্ট্রি। সেটা শিল্প-বিরল দেশের পক্ষে সুখবর। এবং তার মূলে বিপুল গণসংযোগ। সেই যাত্রায় লোকাশ্রয়ী থিয়েটারের রীতিনীতি বেঁচে আছে সামান্যই। সামনে ড্রপ নেই, প্রায় চারধার ঘিরে দর্শকেরা বসে। নেই পেছনে পট, পাশে উইংস-এর মতো বালাই—আলোর কারিগরি, মঞ্চমায়া রচনার চেষ্টা। (যদিও সে সবও মাঝে মধ্যে আমদানি হচ্ছে।) বাংলার গ্রামের অগণিত মানুষ তবুও একে নিচ্ছে। শহরবাসীর কাছেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। আসলে বাণিজ্যিক রঙ্গালয়গুলির ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র জোগাড় করে, তাকে বাড়িয়ে তোলা ফেনিয়ে তোলা আবেগে, অভিনয়ে, পরিস্থিতি তৈরিতে, নাট্য-মুহূর্ত নির্মাণে।

যদি গণ-সংযোগ চাও তো সৃষ্টিকে করে তোল নির্বোধ ও স্থূল—নিরুচ্চার অনুভূতিকে উঁচু চিৎকারে পরিণত কর, ইঙ্গিতগুলি ঘষে তুলে উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটাও।

আমাদের দুশ্চিন্তা—আধুনিক শিল্প-সাহিত্য বা নাট্য-সঙ্গীত এবং চিত্র যদি তার সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে আসতে চায় তাকে কি উঁচু মান থেকে নেমে আসতেই হবে? অন্য পথ নেই? যত নামবে ততই বাড়বে গণসংযোগ? অথবা গণচেতনাকে টেনে তুলতে হবে উঁচু সূক্ষ্ম শিল্পবোধের দিকে? আর সে কাজও একান্ত অসম্ভব বলেই একটা রফা করতে হবে। খুঁজতে হবে মান ও জনগণের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান—মান কিছু বর্জন করে, কিছু রেখে আংশিক গণসংযোগে খুশি থাকা।

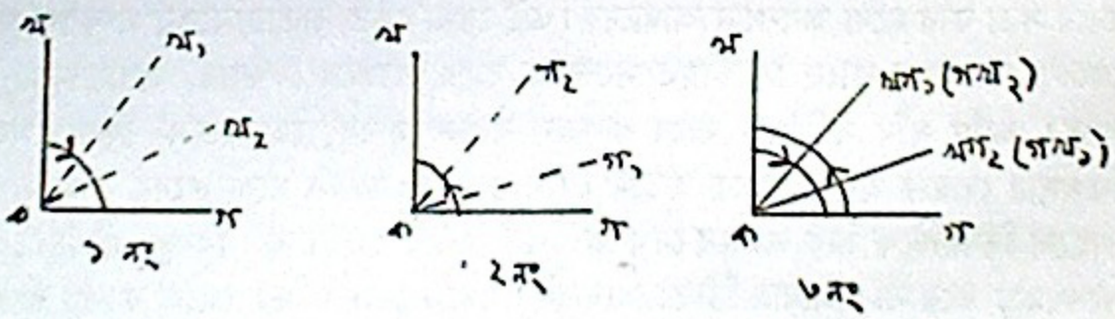

নকসা – ৩২

উপরের নক্সার তিনটি চিত্রেই ক থেকে খ মানোন্নয়ন এবং ক থেকে গ গণচেতনার বিস্তার সূচিত করছে। খ এবং গ বিন্দু যত এগুবে পরস্পরের দূরত্ব বাড়বে। গণ-সংযোগ-প্রত্যাশী শিল্পকে হয় মানকে নামিয়ে আনতে হবে। ১নং চিত্রে কখ১, কখ২ অবস্থান ক্রমেই কখ থেকে সরে আসছে, কগ-এর কাছাকাছি হচ্ছে। গণসংযোগের এই

একটি সম্ভাব্য পন্থা। দ্বিতীয় পন্থা হল গণচেতনাকে মানের দিকে টেনে নেওয়া। ২নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে কগ১, কগ২ অবস্থানগুলি ক্রমেই গণচেতনাকে উন্নত মানের দিকে টেনে নিতে চাইছে। ৩নং চিত্রে কখগ১ (কখগ২) এবং কখগ২ (কখগ১) দুটি ভিন্ন মাত্রায় মান ও গণচেতনার মাঝামাঝি থেকে আংশিক গণসংযোগ করছে। একটা না একটা রফা করছে।

এখানে শেষ পর্যন্ত দুটি প্রশ্ন আমাদের তাড়া করবে।

১. জনপ্রিয়তা ও গণসংযোগ কি সমার্থক?

২. নক্সাগুলিতে আমি যে ক-বিন্দুর কল্পনা করেছি, যেখানে থেকে মানোন্নয়ন এবং গণসংযোগ ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়েছে, শিল্প ও সংযোগের সেই মিলন-বিন্দু কি বাস্তব না নক্সা তৈরির সুবিধার জন্য ভেবে-নেওয়া?

প্রথম প্রশ্নের আলোচনা আপাতত মুলতুবি রইল। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার একটা মোটা মতো জবাব এখনই দিয়ে রাখতে চাই। ক বিন্দুতে আছে মানুষের আদি শিল্প-প্রয়াস, যার ধারা আজও বহন করে চলেছে বিচিত্র লোকায়ত কলা।

● ২. দ্বীপ এবং অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র

একসময়ে সাহিত্যে, শিল্পে জোরটা থাকত বস্তুতে। এমন কি যখন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তীক্ষ্ম ও অভ্রভেদী হয়ে উঠল তখনও শিল্পী-সাহিত্যিক নিজের স্বাতন্ত্র্যের গানকে সামাজিক মানুষের মনের আয়না করে তুলতেন। যেমন গীতিকবিতায়। নাটক-উপন্যাসের নরনারী ব্যক্তি লক্ষণে স্থিত হয়েও, মানব সাধারণের চিত্তের বার্তা বয়ে বেড়াত। তবুও বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত অহংয়ের রোমান্টিকতা আশ্রয়ী আত্মপ্রকাশের মধ্যেই।

একটি উদ্ধৃতি—

> মনে পড়িতেছে কোনো ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি মনে হয়—এক কালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপের মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।২

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থেই লিখুন না আত্মিক গহনতার যে দার্শনিক সুরই এখানে বাজুক, এর সামাজিক ভিত্তি খুঁড়লে পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বার্থের অর্থনীতির খোঁজ মিলবে। মানুষকে সামাজিক সংঘবদ্ধতা থেকে ছিঁড়ে ব্যক্তিত্বের গ্রহে গ্রহে নিক্ষেপ—এ কীর্তি ধনবাদের, এই বোধ আসলে শ্রেণী চেতনাই।

তবুও রোমান্টিকদের স্বপ্ন প্রেম, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সংযোগ বন্ধন-অসহিষ্ণু বিদ্রোহী কামনা এবং বিশ্বব্যাপারে বর্ণাঢ্য ও বিস্মিত আগ্রহ ছিল। এও বুর্জোয়া ধ্যানের এক ধরণের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমে যার সূচনা তা এক বিমূঢ় একাকীত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে পৃথিবী জুড়ে সে ব্যাপারে সর্বব্যাপী হয়ে উঠল, শিল্পে

সাহিত্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাফকার বিচার থেকে কাম্যুর পতন। অস্তিত্ববাদী দর্শন আর বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব। সমাজতন্ত্রের নব্য সাধনা মানবিক সংযোগের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যখন বাস্তব করে তুলতে চাইছিল পৃথিবীর এক প্রান্তে তখনই তার প্রতিবাদ ব্যক্তিমুক্তির তথা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার মন্ত্রোচ্চারণে। এটাই আধুনিক পৃথিবীর ডায়লেকটিক্স। এদেশেও সেই ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা রমনীয় কবিত্বে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি এক হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে...
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো নাকি?
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।৩

বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ নানাভাবে স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, স্বাতন্ত্র-বিলাসী। ভাষার অসাধারণ বক্রতায় ব্যক্তিচিহ্নে তার চারধারের সীমারেখা সংকুচিত হয়ে আসছে প্রতিদিন। তবুও এঁদের অনেককে আন্তরিক বলে মনে হয়। তাঁদের অনুভূতি কিছুটা সময়ের শেষকাটের ফ্যাসান হলেও, অনেকটা ভেতরের। কিন্তু সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের কবিতা-ভীতি ঘুচল না। কবিতাপাঠের আসর বসিয়ে ঘোচানো যায় নি সে অপরিচয়। যাঁরা জনগণের কথা লেখেন, তাঁদের ভাষা-ছবি বড় জোর একটা বুদ্ধিপ্রাণিত স্তরের জন্য। যে ভাষা সকলের, কবিরা তাকে করে তুলেছিল ব্যক্তিগত, কখনও বা গুহ্যাচারী মন্ত্রের মতো। তার মুখ সকলের দিকে ফেরানো গেল না।

বাংলা গল্পসাহিত্যের উঁচু মাপের লেখায় একসময়ে প্যাসিভ নায়কেরা বিচরণ করেছে, শশীর মতো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব৪ আমাদের উপন্যাসের গর্ব বলে বিবেচিত হয়েছে। এত সত্যচরিত্র, তবুও কোন্ নক্ষত্রের অধিবাসী যেন। তারপরে কথাসাহিত্যে এল বাণিজ্যিক পেশাদারি। বাড়তে লাগল তার পাঠকের সংখ্যা, বিক্রি, লাভের বাজার। সত্যবোধ ও আন্তরিকতাকে মূল্য হিসেবে দিতে হল। আবার সেই পুরনো কথা—এই জনমুখিতা, অবশ্যই নিরক্ষর অগণিত মানুষ থেকে অনেক দূর। এবং এই সংকীর্ণ সংযোগও শিল্পগুণের অবনমনেই লব্ধ। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের এই বিশিষ্টতা বুঝবার সুবিধা হবে বলে নিচের নক্সা।

(৭)

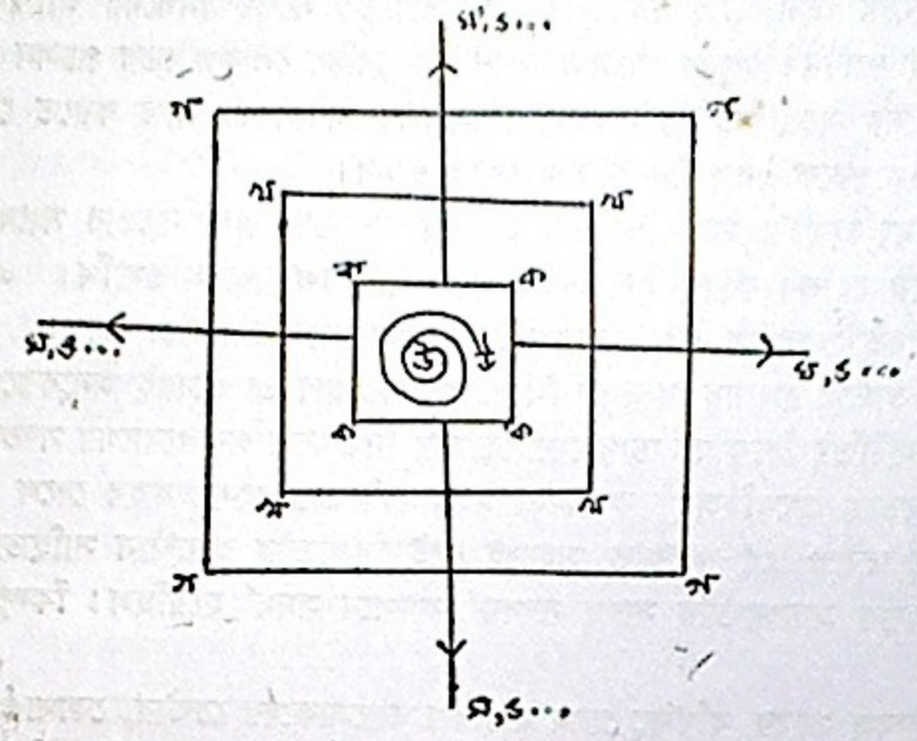

নকসা-দুই

উঃ সাম্প্রতিক জনপ্রিয় বেস্টসেলার উপন্যাসের পাঠকবৃত্ত।
ক-সীমাঃ শিক্ষিত সাহিত্য—পাঠক সমাজ।
খ-সীমা } নানা স্তরের সাধারণ মানুষ—সাক্ষর এবং নিরক্ষর, সাহিত্য-পড়ুয়া নয়।
গ-সীমা }
ঘ, ঙ... ঐ। সীমাহীন (তাই অচিহ্নিত বিস্তার)।

● ৩. ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ

ভাষা মানুষের, ভাষা যখন কথা। ভাষা যখন লেখা, তাতে মুষ্টিমেয়ের অধিকার—বিশেষ করে আমাদের দেশে। দেশের বেশির ভাগ নিরক্ষর—মাত্র সাক্ষর—অল্পশিক্ষিত—সাহিত্য পাঠে সমর্থ খুবই সামান্য—এবং সাহিত্য-পাঠক নগণ্য। সেই নগণ্যকে হিসেবে রেখে জনপ্রিয়তা এবং বাণিজ্য। এখানে যাঁরা সফল সাহিত্যিক তাঁদের সঙ্গে গণমানসের সম্বন্ধ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বাংলায় অধিকাংশের কাছে নামেও অপরিচিত। নহ উৎসব এবং পথযাত্রায় তাঁকে সত্য অস্তিত্ব করে তোলা যায়না।

সাহিত্যের তুলনায় জয় পারফরমিং আর্টের। সে ভাষাসর্বস্ব নয়, ভাষার অধীন নয়—কখনও ভাষা-নিরপেক্ষ। ভাষাকে যখন যতটুকু আশ্রয় করা হয় তা বলার—শোনার, লেখার—পড়ার নয়। সেখানেও গণসংযোগে বিবিধ বাধা, কোথাও বা দুস্তর—যখন তা শ্রেণীগত। অর্থনৈতিক শ্রেণী অবস্থান থেকে রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরভেদে, বেস-সুপারস্ট্রাকচারের নানামাত্রার মিশ্রণে তা জটিল। অভিজাত ও লৌকিক—এইভাবে ভাগ করে বললে এদের চেনা সহজ হবে।

যতটা মনে হয় প্রাচীন ভারতের অতিসমৃদ্ধ নাট্যকলার সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তারা অনধিকারী এবং দূরবর্তী ছিল।৫ এবং দূর থেকে তারা

নিজেদের মতো নানা জাতের লোকায়ত নাট্যরীতি গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের আনুকূল্যে বিকশিত রাগসঙ্গীতের সঙ্গে জনগণের আত্মিক সংযোগ কোনোকালেই ঘটেনি। অঞ্চলে অঞ্চলে নিজধারায় বিচিত্র লোকগীতের প্রচলন হয়েছিল। ক্বচিৎ কীর্তনের মতো গানের মাধ্যমে রাগসঙ্গীত গণনৈকট্য লাভ করতে পেরেছিল। সংযোগের দিক থেকে এরূপ নিদর্শন খুব সুলভ নয়।

পারফরমিং আর্টের মধ্যে থিয়েটার জাতীয় অনুষ্ঠান এবং নৃত্যের সংযোগ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। কারণ এরা একই সঙ্গে শ্রবণদর্শনের অভিমুখি। এদের মধ্যে দৃশ্যময়তা এতই প্রবল যে এরা ভাষার সীমা ডিঙিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে।

ইংরেজ আমলে বাংলায় যে নতুন থিয়েটার তৈরি হল তা ওদেরই অনুকরণে। দেশীয় পুরনো নাট্যরীতির দিকে তা চোখ ফেরাতে চায় নি। ফলে গণসংযোগের সম্ভাব্য সেতুটি আগেভাগে ভেঙে রেখেছিল। কলকাতা মহানগরী তার কেন্দ্র, বৃহৎ দেশে তা ছড়িয়ে নেই। কিন্তু তবুও এই কলকাতা সহরেই সেই বিজাতীয় অনুষ্ঠান সাহিত্য-পাঠকদের তুলনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কি ক্ষুদ্র সে বৃহত্ব।

বড় মফস্বল সহরে, বর্ধিষ্ণু গ্রামে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের চেষ্টায়, কোথাও ধনবান বা ভূস্বামীদের আনুকূল্যে, কলকাতার বাঁধা রঙ্গমঞ্চের আদলে শৌখিন থিয়েটার গড়ে উঠত। তার চারধারে জনমণ্ডলীর একটা স্তর—প্রধানত অল্পাধিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভীড়। গণসংযোগের দিকে এরা এর চেয়ে বড় কোনো ভূমিকা নিতে পারে নি। অন্য দিকে থিয়েট্রিকাল যাত্রার একটা নতুন ধারা তৈরি হয়ে উঠেছিল। এর ভিত্তিতে গণসংযোগের ইচ্ছা কাজ করে থাকবে। কিংবা শুধুই ব্যবসায়িক বোধ থেকে এই ইচ্ছার জন্ম।

লোকায়ত অভিনয় কলার কিছু কিছু অংশ বাণিজ্যিক নব্য মঞ্চরীতির সঙ্গে মিশিয়ে এই যাত্রা তৈরি হয়েছিল। পুরাণো এবং গ্রামীণ মানুষের মধ্যে বহুপ্রচলিত কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য—'থিয়েট্রিকাল যাত্রা' নামকরণ কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এর সম্বন্ধের দিকটা ঠিকমতো বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু লোকপ্রচলিত যাত্রারীতি থেকে খোলা আসর, পট-পর্দা বর্জন, গানের বাহুল্য, পৌরাণিক ভক্তিরস ও৬ বিবেক জাতীয় চরিত্রের সংযোজন ঘটানো হয়েছিল। মোটামুটি সিদ্ধান্ত হল—

বাণিজ্যিক থিয়েটার + পুরনো যাত্রা = থিয়েট্রিকাল যাত্রা।

কিন্তু আরও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হবে, পুরনো যাত্রার উপাদান আমদানি করে কলকাতার নাট্যাভিনয়কে আরও স্থূলতায় বদলে নিয়ে ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছল এই থিয়েট্রিকাল যাত্রা। এখানে সংযোজনের প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিল ব্যবসায়িক নতুন বিস্তৃত বাজার দখলের অভিযান। এই সূত্রে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে রাখছি—ব্যবসায়িক লক্ষ্যে যে সংযোগ তা কি যথার্থ সংযোগ?

আবার ভাষা সমস্যায় ফিরে আসা যাক।

থিয়েটার—গ্রামীণ শহুরে—ব্যবসায়িক শৌখিন, রিচুয়ালিস্টিক, আর্টিস্টিক, স্বতস্ফূর্ত বা প্রথাগত, যাই হোক না ভাষাকে কিন্তু এড়িয়ে যায় না, যদিও ভাষাকে সর্বস্ব এমন কি প্রধান মাধ্যম করেও রাখে না।৭ তারা বর্জন না করলেও 'পড়া'র সীমা ছাড়িয়ে 'শোনা'য় ছড়িয়ে দেয়। আভিনয়িক প্রকাশ শোনার ভাষার আবেদন বাড়ায়। প্রত্যক্ষ ঘটনা ও ক্রিয়া, সাজসজ্জা, অঙ্গভঙ্গী নিয়ে থিয়েটার-জাতীয় অনুষ্ঠান সংযোগের দিকে ভাষা-

সর্বস্ব সাহিত্যকে ডিঙিয়ে যায়। শুধু শিক্ষার বাধা ভাঙার জন্যেই নয়, শিক্ষিত স্তরকেও আরও প্রবলভাবে টানবার ক্ষমতা রাখে বলেই।

ভাষার সংযোগ-ক্ষমতা যে কত শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যমুখী—সে কথা সকলের জানা। মোটা প্রয়োজন থেকে সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতি পর্যন্ত সর্বত্র তার যাতায়াত। ভাষা যখন লিখিত সাহিত্য তখন আরও বেশি করে এই সব সূক্ষ্মতা জটিলতা গভীরতা প্রকাশ পায়। রঙে-গন্ধে-স্পর্শে তার ইন্দ্রিয়ভেদী আবেদন। মুখের ভাষা এতখানি শক্তিধর নয়, কিন্তু স্বভাবত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অকৃত্রিম। তার মধ্যে বক্তাশ্রোতার যোগাযোগ কায়িক-বাচিক ভাবের, আবেগের প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিচক্ষণ ভাবনার একটু উদ্ধৃতি—

> ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।...
>
> কারণ প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।...
>
> প্রকৃত রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে তাহার বেদনা আকারে ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না।৮

লেখার ভাষা জলজ্যান্ত জীবনের ভাষার কাছে প্রতিক্ষণ ঋণী। এই কারণেই মুখের ভাষার ভিত্তিতে তৈরি সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের পরিমার্জিত জটিলতা যদি বা হারায়, সহজে অনেক মানুষের কাছের বস্তু হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আর দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমস্যাটির অন্য একটা দিকে তাকানো যাক।—

১. (একটি বোবা মেয়ের কথা বলতে গিয়ে)

> কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো, সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপর ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে।৯

২.

> মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধচারিধারে,
> ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
> মানুষের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।...
> প্রভাতের শুভ্রভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
> জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্ঘাটন
> নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;

যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে সমস্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্বখেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস ;১০

উদ্ধৃতি দুটি শুধু একটা বক্তব্য বলে নি, রচনা-কৌশলে প্রমাণ করেছে, মৌনের যে আবেদন বিশ্বনিখিলে এবং স্বভাব বা পরিস্থিতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো মানুষে, তাকে উঁচু মাপের কবিশিল্পীরা, যেমন রবীন্দ্রনাথ, ভাষায় তর্জমা করে নিতে পারেন, যদিও তা পৌঁছবে মুষ্টিমেয় ভাষারসিক ভাবুক মনের কাছে। নিসর্গ ও মানুষের মৌনকে ভাষার দ্বারস্থ না করে, নৃত্যের ভঙ্গীতে (কোথাও ভাষাগীতির কোথাও শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে), নীরব ক্রিয়াকলাপে, মূকাভিনয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা হতেই পারে। সকলেই জানেন যে বিবিধ পারফরমেন্সের মাঝে মাঝে ভাষাহীন অংশ কিছু থাকে, তারা কিন্তু মোটেই আবেদনহীন নয়। তাছাড়া অন্য অনেক দেশের মতো এখানেও এমন পারফরমেন্স ছিল বা আছে যা পুরোপুরি ভাষাহীন কিংবা ভাষা যেখানে গুরুত্বহীন। এদেশের সাম্প্রতিক মূকাভিনয় দেহভঙ্গীতে ভাষাধৃত রচনাদিকে মাথায় রেখে তারই একধরনের তর্জমামাত্র, এবং সে কারণেই সীমাবদ্ধ। যেখানে তা স্বাধীন হয়ে উঠতে পেরেছে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু করেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমে লিভিং থিয়েটারের একটা ধারণা এসেছে। তাতে দেহের ভাষাকে প্রাণীজগতের আদিম ও সর্বজনীন ভাষা বলে মনে করা হচ্ছে যা নাকি দেশে দেশে তো বটেই, সময়ের যে দূরত্ব তাতেও, সেতু বাঁধতে পারে।১১ এই দর্শন থেকে ফিজিক্যাল অ্যাকটিং-য়ের বোধ দানা বেঁধে উঠেছে। এই পরীক্ষা সাংস্কৃতিক গণসংযোগের ক্ষেত্রে একটা বড় দরজা খুলে দিতে পারে।

● ৪. দৌড়, প্রযুক্তির পেছনে

টেলিভিশনকে যত গণ্ডমূর্খের কাণ্ডকারখানা১২ বলে যাঁরা ব্যঙ্গ হাস্য করেছিলেন, আজ সে হাসি লুকোবার জায়গা মেলে না। এই টেলিভিশনের কথায় পরে আসব। একটু পেছন থেকে শুরু করা যাক।

প্রথমে গ্রামোফোনের কথা। অনেকটা বই কিনে সাহিত্যপাঠের মতো, রেকর্ড কিনে গান শোনা। নিজের খুশিতে পছন্দে। আসর থেকে, সহর-কেন্দ্র থেকে এর ফলে গানকে নিয়ে আসা গেল দূর মফস্বলে, নিজের ঘরের কাছাকাছি। পঙ্কজ মল্লিক-কমলা ঝরিয়ারা, রবীন্দ্র-নজরুল গীতি অনেক মানুষের সঙ্গে সমযোজিত হতে থাকে। গায়কের ব্যক্তিগত উপস্থিতি থেকে গানকে বিচ্ছিন্ন করে উপভোগ—স্থানের দূরত্ব ডিঙিয়ে যাওয়া, সময়ের বাধাও। মুদ্রণ ও প্রকাশনা যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল সাহিত্য-সংযোগের ক্ষেত্রে অনেককাল আগে, সেই বিপ্লব গ্রামোফোন আনল গানের জগতে। যন্ত্র—আরও উন্নত যন্ত্রের পেছনে চলল সাংস্কৃতিক সংযোগ। আর এসব যান্ত্রিক ব্যবহারই বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত।

নগর কেন্দ্রের সংগীত-সংস্কৃতিকে জনমণ্ডলীর (তারও সীমা সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ-কাল ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আশ্রয়ী) পরিধির সঙ্গে সংযোগ সাধনে গ্রামোফোন গুরুতর ভূমিকা নিয়েছিল। প্রযুক্তির ক্রমিক উন্নয়নে ক্যাসেটে প্লেয়ারে তার বিবর্তন—তাতে কিন্তু

সংযোগে কোনো নূতন মাত্রা আসে নি। একথা ঠিক, যান্ত্রিক উপাদানগুলি সহজলভ্য হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে বলে আনুপাতিক ব্যবহারও বেড়েছে, মধ্যবিত্ত থেকে অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত নিম্নবিত্তের একটা অংশ পর্যন্ত প্রভাববৃত্ত প্রসারিত হয়েছে, গ্রামের কাছে, শ্রমিক বস্তিতে রেকর্ড-ক্যাসেট বাহিত গান ঢুকে পড়েছে।১৩ কিন্তু এর ফলে জনমণ্ডলীর এই নতুন স্তরগুলিতে একটা বাইরের প্রভাবের বেশি কিছু ঘটেছে মনে হয় না। এমন নয় যে ক্যাসেট-বিপ্লব সংগীত-সংস্কৃতির মহানাগরিক তথা স্টার-পদ্ধতির ছোটগণ্ডী ভেঙেছে, নব নব অনেক কেন্দ্র গড়ে তুলতে পেরেছে, কিংবা কেন্দ্রটি ক্রমপ্রসারিত হয়ে পরিধির কাছে এসে পৌঁছেছে। রেকর্ডে ক্যাসেটে নাটকাদির প্রচারও কিছু কম হয় নি। কিন্তু আজও রেকর্ড নাটা শ্রুতি-নাটকাদির বিশিষ্ট ধর্ম আয়ত্ত করে একটা বিশিষ্ট আর্ট-ফর্ম হয়ে ওঠে নি। এর আবেদন সংযোগের দিক থেকে কোনো উল্লেখ্য বিষয় নয়।

সিনেমা এবং রেডিও বৈপ্লবিক শক্তি নিয়ে দেখা দিলেও বহুকাল পর্যন্ত তারা ছিল বাধাগ্রস্ত, স্খলিতগতি। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বেতারের প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যুৎ কিছু সংখ্যক জেলাসহর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এবং রেডিও ছিল পুরোপুরি বিদ্যুৎ-নির্ভর। ৪৫-৪৬ সালে মহকুমা সহরে মোটর-ব্যাটারি চালিত রেডিও সেটের সামনে যুদ্ধ ও দাঙ্গার তাজা খবর শুনবার জন্য ভদ্রলোকদের ভীড় ও আগ্রহ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। দুর্বোধ্যপ্রায় শব্দ মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় খবর শুনে তাঁদের কৃতার্থ হতে দেখেছি। শহরের কেউ কলকাতায় রেডিওয় গান গেয়ে এলে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠতেন।

সিনেমার বেলায় একই ব্যাপার। ওটা মূলত কলকাতার সম্পত্তি, জেলা সহরে দু-একটি স্থায়ী হল তৈরি হয়েছিল। মহাকুমা এবং বড় গঞ্জে ডায়নামো চালিয়ে এক দেড় মাস সিনেমা আমদানি হত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে—কলকাতার পাবলিক থিয়েটার দল বা যাত্রাপার্টির সাময়িক ভ্রমণের মতো সেই আয়োজন। আর একটা প্রমোদ, অনেক চমকপ্রদ। ছবিতে মানুষেরা নাচছে গাইছে, কথা বলছে, পাহাড় জঙ্গল সমুদ্র সামনে। বিস্ময় ও উত্তেজনাই প্রধান, অপরিচয়ের দূরত্বে যার ভিত্তি। এ-সব নেহাৎ সাময়িক যোগাযোগ (ক্যাজুয়াল কনট্যাক্ট) সাংস্কৃতিক সংযোগ নয়।১৪

স্বাধীনতার পর থেকে এই দুই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক মাধ্যমের ক্রমিক বিকাশের ফলে সংস্কৃতি সংযোগে বিবর্তমান তাৎপর্য কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্বাধীনতার পর থেকে রেডিওর ব্যবহার, কেন্দ্রগুলির সংখ্যা এবং সম্প্রচার ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে। বিদ্যুতের সুযোগ ছোট শহর এবং গঞ্জগুলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছেও একটি বেতারগ্রাহক যন্ত্র অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তারপরে ছয়ের দশক শুরু হতে ট্রানজিস্টার-প্রযুক্তি রেডিওর ক্ষেত্রে এক বিশেষ পরিবর্তন আনে। আজ গ্রামের সম্পন্ন কৃষক এবং মাঝারি দোকানদারের কাছে এটি একটি প্রয়োজনীয় বস্তু।

সরকারী ব্যবস্থাপনা বলে রেডিও মুনাফামুখী প্রতিষ্ঠান নয়। তাই রেডিও-শিল্পীদের মধ্যে নাগরিক বঙ্গ অফিস স্টারদের একচেটিয়া প্রাধান্য নেই। অনেক শিল্পী একেবারে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে আসছে, যাদের কেউ পেশাদার নয়। পারফর্মার-অডিয়েন্সে, বিস্ময়-বিহ্বল দূরত্ব না-থাকা সংযোগের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু গানের কথায় সুরে পেশাদার অপেশাদারে পার্থক্য নেই, একই সাংস্কৃতিক রুচির দিকে এদের দুদল-এর লক্ষ্য। কাজেই সংযোগের সেই সম্ভাবনা আর

কার্যকর হয়ে ওঠে নি। কখনও সখনও মফস্বল বা গ্রামীণ অনুষ্ঠান তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে রেডিওতে আমন্ত্রিত হয় বটে, তবে সেই অতি সীমিত আবেদন কোনো উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারে না। এই বিরাট দেশে সাংস্কৃতিক স্তরের ও শিক্ষামানের বৈষম্যের মধ্যে যদি অঞ্চলে অঞ্চলে ছোট পরিধিতে বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হত, তাকে নাগরিক জলসার রিলে সেন্টারে পরিণত না করা হত, স্থানিক সঙ্গীত শিল্পীদের সহযোগে একটি সুস্থ সংযোগ বিধি গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয় নি, মূলত শহরের গান প্রভৃতি শুনবার যন্ত্র হয়েই থাকল রেডিও।

উপরন্তু এই সরকারী প্রতিষ্ঠানও অংশত ব্যবসায়ীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কার্যক্রমে হিন্দী ফিল্মিগানের ব্যাপক আয়োজন থাকছে। তাতে সাময়িক মুগ্ধতা আসতে পারে, সংযোগ ঘটে না।

কোথাও কোথাও যেমন কলকাতায়, বেতার নাট্য আজকাল একটি শ্রুতি নির্ভর শিল্প-রূপ হয়ে উঠতে পেরেছে। একটি সংকীর্ণ গণ্ডীতে শিল্পগত সংযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি নূতন প্রাপ্তি। কিন্তু ব্যাপকভাবে কার্যকর টেলিভিশন আমাদের মধ্যে দাপটে প্রবেশ করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশে সিনেমা শিল্পের, ব্যবসা এবং কলা দুই অর্থেই,—ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিরাট পুঁজির ব্যবসা হিসেবে যেমন সিনেমা আজ একটা বড় সমাজ-সত্য, আবার অনেক উঁচু দরের ছবি তৈরি হবার ফলে কলা হিসেবেও এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠা। জন-সাধারণের কাছে সিনেমা এক পরম আকর্ষণীয় প্রমোদ। গ্রামোফোন রেডিওর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সেখানে শুধুই শব্দের আয়োজন—সিনেমায় শব্দ ও দৃশ্যের সমন্বয়। দৃশ্য-ময়তা বহুমাত্রিক এবং সর্বগ্রাসী। কতক নাট্যাভিনয়ের মতো, যদিও থিয়েটারে জীবন্ত নরনারী আর এখানে শুধুই ছায়াছবি—কিন্তু বাস্তব জীবনের বিভ্রম ঘটাতে কোনও ফাঁক নেই। বরং বাড়তি আছে, বিশ্বজোড়া যে নয়নরঞ্জন আয়োজন তার সংযোজন। এসব কারণে সিনেমার প্রবল আকর্ষণ, জনমনে প্রভাব বিস্তারে প্রচণ্ড ক্ষমতা। স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে সিনেমা হলের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলেও সুদূর পল্লীর লোককেও টানছে। তবে তাদের দেখাশুনো এখনও অল্পই। শহর-শহরতলীর বস্তিবাসী গরিব মানুষের উপরে এর গভীর ছায়া পড়ছে। বালকের চিত্তগঠনে, অপরিণত মনকে প্ররোচিত ও মোহগ্রস্ত করতে, বয়স্ককে আগ্রহী, সানন্দ বা বিরক্ত-বিমুখ করতে সিনেমা কাজ করে চলেছে। এটা বড় মাপের ব্যবসা, বিরাট পুঁজির ঝুঁকি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল ধরণের সেন্সরে সীমাবদ্ধ—প্রধানত এই তিনটি কারণে বেশির ভাগ ছবি সস্তা চটকদার, অলীক কল্পনার আশ্রয় এবং ফর্মুলা ধরে তৈরি। তারা বিশ্বাস জাগায় না, স্বপ্নও দেখায় না, নেশাগ্রস্ত করে, চোখে কানে তাৎক্ষণিক মোহ আনে, বিচারকে ঘুম পাড়ায়। সংযোগে তাদের ভূমিকা তাই প্রত্যাশার কাছেও পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া সিনেমা কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রকে আশ্রয় করে, সে-সব কেন্দ্রে শিল্পী-কারিগর-পরিচালকদের নিয়ে এমন পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে যার চারপাশে রহস্যের বর্ণাঢ্য পর্দা যা টানে কিন্তু কাছে আসতে দেয় না। বড় কারখানায় তৈরি এই পণ্য বাজারে ছাড়া হয়। বিকল্প মাল নেই। তাই কিনে খুশি হতে হবে।

আর একটা সমস্যা ভাষার বাধা। যেমন নাকি উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে হিন্দী ছবির সবচেয়ে বড় বাজার। কিন্তু এই বিপুল দেশখণ্ডের অনেক দর্শকই এ ভাষা বোঝে

না, দেখে শুধু ছবি আর সুরের জন্য। প্রায়ই তা নির্বোধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ওপরে ওঠে না।

এই পরিস্থিতিতে, সিনেমা একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী গণমাধ্যম হলেও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরিসীম হলেও, সংযোগ যদিবা কখনও কিছুটা ঘটেও, তা আন্তরিক হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না।

এবারে, এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম, টেলিভিশন। সাম্প্রতিক সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি-বিদ্যার বিস্ফোরণে, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ যোগাযোগের ক্রমোন্নয়নে টেলিভিশনকে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকে আরও কতদূর এগিয়ে দেবে তার কিছু আঁচ করা যাচ্ছে। এর সঙ্গে যদি যুক্ত করি ভিসিপি-ভিডিও ক্যাসেট ব্যবহার-ব্যবস্থা তো মানতেই হবে গ্রামাফোন, রেডিও, সিনেমার যোগফল আরও বহু গুণিত হয়েছে এর শক্তির মধ্যে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশেও এই সব কিছুর ফল ফলতে শুরু করে দিয়েছে।

অবশ্য একচেটিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এর অনেকটা ক্ষমতা শুষে নিতে চাইছে। ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দী চাপানোয় অন্য ভাষাভাষী দর্শক-শ্রোতার একটা বড় অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ব্যাহত হচ্ছে। এই বিশাল দেশে আঞ্চলিক সম্প্রচারকে পুরো-পুরি দিল্লীর পরাধীন করে রাখায় বিচিত্র সংস্কৃতির পরিবেশন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। অতিমাত্রায় কেন্দ্রানুগত্য সারা দেশকে একই ধরণের কার্যক্রমে বেঁধে রাখছে।

টি. ভিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব—এই সব বিতর্কে আমার বর্তমানে ঢোকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গণসংযোগের দৃষ্টিকোণে টি. ভিতে দিল্লীর সর্বময় কর্তৃত্ব যে-সব জটিল সমস্যা এর মধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে, এবং ক্রমে যা আরও বেড়ে যাবে, তার উল্লেখ করলাম।

বিজ্ঞাপন দাতাদের কার্যক্রমও কিন্তু টি. ভি-র এই চরিত্রে কোনো বদল ঘটাচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের অর্থ সরাসরি সরকারী দখলী সত্ত্বকে যৌথ উদ্যোগে রূপান্তরিত করছে না।

পশ্চিমের মতো ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিযোগিতায় টি. ভি-র বহু চ্যানেল খুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় কি না এককথায় তার উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রতিযোগিতা কার্যক্রম বৈচিত্র্য আনবে এবং মানোন্নয়নে সহায়ক হবে, তাছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেও নানা অঞ্চলে প্রবেশের দরজা খুলে দেবে। আবার মুনাফার লড়াই, এবং কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁধা খাদ্যের বরাদ্দ বিকৃতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

অন্তত এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য—সব কথা ভেবে চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণের দিকে গেলেই গণসংযোগে টি. ভি. তার যথার্থ ভূমিকা পালনের উপযোগী হবে।

গ্রামীণ অনুষ্ঠান গ্রাম থেকে গ্রামে এবং শহুরে মানুষের কাছেও নিয়ে যাওয়া, শহুরে সংস্কৃতিকে রেডিও সিনেমা নাট্যাভিনয়ের তুলনায় অনেক ভালোভাবে গ্রামে নিয়ে আসায়, এবং এই প্রক্রিয়াকে নিয়মিত করে তোলায়, সমযোজনের যে সম্ভাবনা টি. ভি. সৃষ্টির করেছে তার পুরো সদ্ব্যবহার অবশ্য এখনও অনেক দূরে।

মনে রাখা দরকার, এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচেকার মানুষের কাছে গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি সেণ্টারে টি. ভি- পৌঁছে দেবার কোনো প্রকল্প রচিত বা কার্যকর হয় নি। সে রকম কিছু ঘটলে এ দেশের সংস্কৃতি-সংযোগে টি. ভি-র ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত। এবং উপরে যে সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছি তার কোনো কোনো দিক

ভবিষ্যতে সত্য হয়ে উঠতেই পারে।

আলোচিত সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বলা যায় সম্প্রতি মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ শহর আধাশহরবাসী মানুষের কাছে টি. ভি. নিয়মিত দর্শনের বিষয় হয়েছে এবং সংস্কৃতি প্রচারের যতটা আয়োজন করা হচ্ছে তাতে এই সব স্তরের সঙ্গে সংযোগ প্রবাহ গাঢ় হয়ে উঠছে।

টি. ভি.-র পরিবেশনে প্রচলিত আর্টফর্মের আনুগত্য এখনও চলছে। বেশিরভাগ, সিনেমা বা নাট্যাভিনয়ে, ছো-নাচ বা বাউল, রবীন্দ্র-নৃত্য বা গানের আসর নিজ নিজ জগতে যেমন তেমনি ধরা হচ্ছে ছোট পর্দায়। এখনও টি. ভি. প্রায় একটি মাধ্যম মাত্র। তবে উল্লিখিত প্রতিটি পারফরমিং আর্ট এই মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে রূপে আবেদনে বদলে যেতে পারে, বদলে যাবেই। তখন সংযোগের দিকে কি ধরণের নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে তা এখনই অনুমান করে লাভ নেই।

● ৫. সংযোগের সর্বদা সন্ধান

যখন যেখানে বিচ্ছিন্নতা, সংযোগের চেষ্টাও সেখানে অবিরাম। কারণ একাকীত্ব শুধু দুঃসহই নয় মানুষের ধাতু-বিরোধী বলে অসম্ভবও। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নতা সামাজিক ব্যাধি হয়ে ওঠে উনবিংশ শতকে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীগুলির পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। মনোজগতের বিপুল ঐশ্বর্য ও ঔজ্জ্বল্যের গভীরে যে অন্তর্লীন অভিশাপ এদের পীড়িত করেছে তার মধ্যে ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা ও দার্শনিকতার নানা উপাদান থাকলেও তা মূলত সমাজঘটিত একটি শ্রেণী সমস্যা হয়ত কাছাকাছি অবস্থিত একাধিক শ্রেণীর যৌথ সমস্যা। এর আদি যুগের সচেতন নিদর্শন হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের কথাই প্রথমে মনে পড়বে। কমলাকান্ত বলেছে,

> আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ জড়িত জলবুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটা বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?
> তাহা জানি না কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ গ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।১৫

কমলাকান্ত প্রীতির মধ্যে সংযোগ খুঁজেছিলেন অগণিত মানুষের সঙ্গে। জেনেছিলেন সংযোগে রোগের শান্তি। কিন্তু পবিত্র সদিচ্ছায় ইতিহাসের শাপমুক্তি ঘটে না। লেট দেয়ার বি লাইট—বললে উদ্ভাসিত আলোয় অন্ধকার মোছে না।

এ নিয়ে অজীবন যিনি অনেক ভেবেছেন, তাঁর জীবন শেষের এই স্বীকারোক্তি—

> মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।১৬

এই যোগ করার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত জানতে পারেন নি।

যত তীব্র লেখকের শিল্পীর মানুষের একাকীত্ব, তত গভীর ব্যাপক ও বিচিত্র তার সংযোগ-সাধনা। মানুষের ভাষার, বিবিধ সৃষ্টির মূল অভিপ্রায়ই হল অপরের কাছে পৌঁছতে চাওয়া। আমার ভাবনা সকলের হোক, যা দেখেছি অন্যে দেখুক, আমার শোক-সুখ ক্রোধ আনন্দ সঞ্চারিত হোক সকলের মধ্যে। কত সোজা বাঁকা ভাঙাচোরা, ভাষা ছবি সুর—কোথাও স্পষ্ট উজ্জ্বল অথবা রহস্যঘেরা ইঙ্গিতময়—লক্ষ্য একটিই—অন্যের সঙ্গে চাই সংযোগ। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের সঙ্গে সৃষ্টির। আবার রবীন্দ্রভাবনার দ্বারস্থ হওয়া যাক—

> এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই—কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত খোস্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে। কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না ; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাড়িঘর, আমার আসবাব-পত্র, আমার শরীর মন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।১৭

তত্ত্বামৃত প্রচারকেরা বাস্তব জীবনের উদাহরণ দেন, লোক-প্রচলিত গালগল্পের আশ্রয় নেন। সাধক কবিরা রূপকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি আঁকেন, যা শ্রোতার পরিচিত, চিত্তরঞ্জক। প্রাচীন বৌদ্ধ কবিদের কথা ভাবা যাক। তাঁরা ছবি এঁকেছেন, পাহাড়ের চূড়ায় খররবি স্নাত সদ্য শিকল-ছেঁড়া উল্লসিত হাতির, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ফুল-ভরা কাপাস খেতে মত্ত শবরী-নৃত্যের। এগুলি তো তাঁদের তত্ত্বভাবুকতার লক্ষ্য ছিল না। এসব মায়া, আকাশকুসুমের মতো অলীক। তবু এই বাস্তব ছবির মধ্য দিয়ে বাস্তব মানুষের মনের পথ খুঁজতে হয়েছে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নাটকের মোচড় দিয়ে পাঠকের মনের দরজা খুলতে চান। রবীন্দ্র-নাথ গল্প বলতে বলতে চিত্রশিল্পীর জন্য অপেক্ষা না করেই ছবির পরে ছবি আঁকেন। ভাষার সঙ্গে রেখার বিন্যাস জুড়তেই হবে।১৮ গান গাইতে গাইতে বাউল দুপাক নেচে নেন। কারণ এঁরা সংযোগের নব নব সূত্র খোঁজেন। হয়ত অনেকের প্রত্যক্ষ ভাবনা পাঠক-দর্শক-শ্রোতার আরও মনোরঞ্জন, তাদের আরও বেশি আকর্ষণ করা ; কারুর মনোভাব এমনটা না হলে আমার কথা ঠিকঠাক প্রকাশ করা গেল না। আসলে এ সবই হল সংযোগকারী প্রক্রিয়া।

সকলেই ভাবতে বুঝতে চান কাদের জন্য লিখি, আঁকি—কতদূর প্রসারিত হতে পারে সেই পরিধি, কতখানি ঘনিষ্ঠ করে তোলা সম্ভব। নিবিড়তা এবং বিস্তার সংযোগে এই দ্বিমুখী সাধনা শিল্পীর, এতে ব্যর্থতা বা সাফল্যেরও নানা মাত্রা। তারই একটি সরল সম্ভাব্য রূপ নিচের নক্সায় দেখাতে চাই—

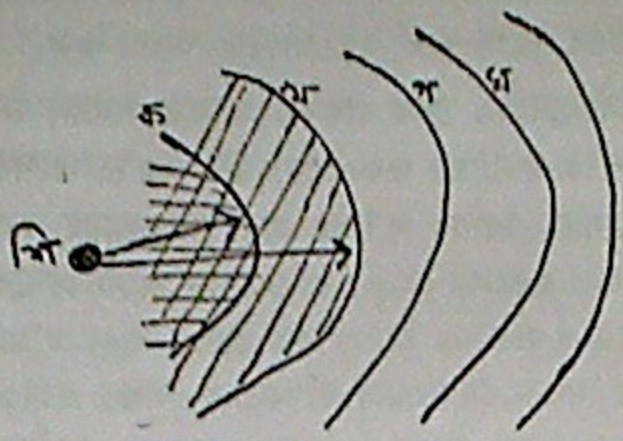

শি - শিল্পী। ⟶ - সংযোগের বিস্তার।
ক খ গ ঘ ... - জনমণ্ডলীর বিভিন্ন স্তর।
[ ] - সংযোগ [ ] - নিবিড় সংযোগ।
নকশা - তিন

নক্সাটিকে আধুনিক কোনো শক্তিমান শিল্পীর সংযোগ প্রয়াসের মূল্যায়ন হিসেবে দেখা যায়। ব্যাপারটা অল্পাধিক প্রতিনিধিস্থানীয়। শিল্পীর সংযোগ ক—স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তিনি খ—স্তরে প্রসারিত হলেন নানা কৌশলে। কিন্তু জনসাধারণের বৃহত্তর পরিধিগুলো (গ ঘ ইত্যাদি) তাঁর অনায়ত্ত থেকে যাবে। আরও দেখা যাবে যতটা তাঁর প্রসার তার সর্বস্তরে সংযোগের নিবিড়তা সমান নয়, হতেও পারে না।

শিল্পের রূপায়ণ সর্বদাই পাঠক-দর্শক-শ্রোতার অভিমুখী। সে দিক থেকে ভাবলে সংযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব সব স্রষ্টাকেই পালন করতে হয়। বড় মাপের শিল্পকার স্পষ্ট জানেন, কোন স্তর পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি, কোন স্তর পর্যন্ত যাবার চেষ্টা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ও সংগত। কোথায় তাঁর প্রবেশ নিবিড় হতে পারে, কোথায় তা শুধুই ভাসমান। সব সময়ে সবাই তা জানতে বুঝতে পারেন না। কেউ কেউ কিন্তু জেনে বুঝে সংযোগের শিকড় ঢুকিয়ে দিতে চান গভীরে।

যাঁরা সমাজবাদে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন, এমন লেখকেরা অনেক সময় কাদের হয়ে লিখছেন এবং কাদের জন্য অর্থাৎ পড়বার জন্য লিখছেন এ দুটো গুলিয়ে ফেলেন। মজুর-কৃষকের কথা তাদের দৃষ্টিকোণে লেখা হলেও ওরা তো পাঠক নয়—সামান্য কিছু ব্যতিক্রম যদি থাকেও। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতে পারে এ-সব লেখা। সংযোগ ঘটাতে হবে তো এদের সঙ্গে। সেটা ভুলে যাওয়ায় এই সংযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়ে, কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে সংযোগের সূত্র মেলে না।

অন্য দিকে ভাবা যাক মধুসূদন দত্তের কথা। সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবনা-চেতনা, সমকালীন ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালির মনে সঞ্চারিত করার জন্য তিনি তাদের মনের গভীরে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রাম-রাবণ কথার সিদ্ধ উপাদান নিয়ে কাজ করলেন—সম্পূর্ণ বিপরীত আবেদন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। পাঠকশ্রেণীগুলিকে চিনে নিবিড় সংযোগের এ-এক সচেতন অভিপ্রায়।

আরও যাট বছর পরে শরৎচন্দ্র সম্ভাব্য পাঠক-সমাজের বুদ্ধি খেয়ালে রেখেছিলেন। পড়তে সমর্থ অল্পশিক্ষিত পুরুষ এবং গৃহবন্দী নারীদের বিপুল ও ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যথার্থ ক্ষমতা বঙ্কিমের বর্ণাঢ্য কল্পনা বা রবীন্দ্রের অভিজাত

রচনার ততটা ছিল না। শরৎচন্দ্র এই মানুষদের বিষয়ে এদের ভাবাবেগ সহানুভূতি এবং বিদ্রোহবিমুখ গার্হস্থ্য দৃষ্টির সহযোগে পরিবেশন করলেন। একজন সচেতন সংযোগ-সৃষ্টিকারীর ভূমিকা পালন করলেন।

- ৬. জনপ্রিয়তা—সংযোগ—প্রভাব

কোন গল্প বা নাট্যাভিনয় কিংবা গানের জনপ্রিয়তা বুঝে নেবার স্পষ্ট মাপকাঠি আছে। কারণ এর সবগুলিই ভদ্রসমাজে ক্রয়যোগ্য পণ্য। কাজেই হিসেবপত্র পাওয়া কিছু শক্ত নয়। তুলনায় সংযোগের মাত্রা চিনতে কিছু ভেতরের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অনেক সময় ধরে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের অভ্যাস ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এর খোঁজ করতে হয়। প্রভাবের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী ব্যাখ্যায় জানা যায় প্রায়ই বাইরের প্রভাব আসলে প্রভাবই নয়, অনুকরণ বা বড়জোর অনুসরণ। যেখানে প্রভাবের কোনো স্পষ্ট চিহ্ন নেই, সেখানেই হয়ত ব্যক্তি বা সমাজ সত্তার গভীরে তার মশাল বহন করে। এই তিনটি বিষয় নিয়ে আপাতত বিচার্য হল—

১. জনপ্রিয়তার সঙ্গে সংযোগের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, থাকলে তা কি ধরণের।

২. জনপ্রিয়তা প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করে? আদৌ কিছু করে কি?

৩. সংযোগ এবং প্রভাব, একে অপরের সঙ্গে কতটা কিভাবে সংশ্লিষ্ট।

এই তিনটি বিষয়েরই নানা স্তর-উপস্তর। উপস্তরগুলি কম-বেশি-মাঝারি এমনি পরিমাণবাচক। তার মধ্যে না গিয়ে প্রধান স্তরগুলির কথাই বলি।

১. জনপ্রিয়তা	২. সংযোগ	৩. প্রভাব
১.১. সাধারণ	২.১. সাধারণ ও বহিরঙ্গ	৩.১. সাধারণ ও বহিরঙ্গ
১.২. ব্যাপক	২.২. ব্যাপক ও বহিরঙ্গ	৩.২. ব্যাপক ও বহিরঙ্গ
১.৩. স্থায়ী	২.৩. গভীর	৩.৩. গভীর
	২.৪. স্থায়ী	৩.৪. স্থায়ী

অবশ্যই স্থায়ী শব্দটিকে চূড়ান্ত অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। আর গভীর জনপ্রিয়তা বলে কিছু হয় না।

প্রথমে জনপ্রিয়তা ও সংযোগের সম্পর্কে পরীক্ষা করা যাক—

× হয় না। ✓ হতে পারে। ● অবশ্য হবে। — অভাব

১.১ ⟹	২ × ১.১ ✓	} বিকল্প অবস্থা।
১.২ ⟹	২.১ ● ২.২ ✓	} "
১.৩ ⟹	২.২ ● ২.৩ ✓	} "
১ – →	২ ✓	

১. সাধারণ স্তরের জনপ্রিয়তা সংযোগ সৃষ্টিতে পুরোই ব্যর্থ হতে পারে, অথবা সাধারণ মাত্রায় বহিরঙ্গ সংযোগ ঘটাতে পারে।

২. ব্যাপক জনপ্রিয়তার সঙ্গে সাধারণ ও বহিরঙ্গ সংযোগের অনিবার্য সম্পর্ক। ক্বচিৎ তা ব্যাপক বহিরঙ্গ সংযোগ ঘটাতে পারে।

৩. স্থায়ী জনপ্রিয়তা অবশ্যই ব্যাপক বহিরঙ্গ সংযোগ ঘটাবে, কখনও তা গভীর সংযোগও হতে পারে।

৪. জনপ্রিয়তা এতই কম যদি হয় যাকে সাধারণ স্তরেও ফেলা যায় না, যাকে এক অর্থে বলা যায় জনপ্রিয়তার অভাব, সেক্ষেত্রেও সংযোগ ঘটতে পারে। যেমন, এখানকার পড়ুয়া সমাজে মানিকবাবুর চেয়ে শঙ্কর অনেক জনপ্রিয় কিন্তু জনপ্রিয় না হলেও পাঠকসমাজের চিত্তলোকে মানিকবাবুর উপন্যাস অনেক বেশি সমাযোজিত। বিভিন্ন ধরণের গ্রাম নাটক পল্লীর মুষ্টিমেয় মানুষের সমাবেশে অভিনীত হয়, গ্রাম্য কথকতা বা ভাসান গানও ছো নাচের মতো লোক টানতে পারে না। কিন্তু সংযোগ ক্ষমতায় তারা কিছুমাত্র ন্যূন নয়।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রভাবের সম্পর্ক কি? নিচে তার কিছু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি।

১. সাধারণ স্তরের জনপ্রিয়তা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না, ক্বচিৎ একাও বহিরঙ্গ ও প্রাথমিক প্রভাব ফেলে।

২. ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে সাধারণ বহিরঙ্গ প্রভাব না পড়ে পারে না। কখনও বা খুবই কম ; বহিরঙ্গ কিন্তু ব্যাপক প্রভাবও পড়তে পারে।

৩. স্থায়ী জনপ্রিয়তা ব্যাপক বহিরঙ্গ প্রভাব তো ফেলবেই, গভীর প্রভাবও ছড়াতে পারে।

৪. জনপ্রিয়তা ছাড়াও প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে তা খুব ব্যাপক হবে না কিন্তু গভীর হতে পারে।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে সংযোগ ও প্রভাবের সম্পর্ক অনেকটা একধরণেই। সংযোগ ও প্রভাব-এ দুয়ের সম্পর্ক সবটা নয় তবে অনেকখানি সমান্তরাল। প্রায়ই সংযোগ যেমন প্রভাব ও তার আনুপাতিক।

অর্থাৎ,

১. সাধারণ ও বহিরঙ্গ সংযোগের ফলে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না হতে পারে, আবার কখনও বা ব্যাপক ও বহিরঙ্গ প্রভাব বর্তায়।
২. ব্যাপক ও বহিরঙ্গ সংযোগের ফলে অবশ্যই সাধারণ ও বহিরঙ্গ প্রভাব বর্তাবে, কখনও বা ব্যাপক ও বহিরঙ্গ প্রভাবও বর্তায়।
৩. গভীর সংযোগের ফলে কিন্তু গভীর প্রভাব ঘটবে।
৪. স্থায়ী সংযোগের ফল স্থায়ী প্রভাব।
৫. সংযোগের অভাবে প্রভাব সৃষ্টি হয় না।

প্রায়ই সংযোগ ও প্রভাব সমান্তরাল, উপরের ৩, ৪, ৫ সূত্র দ্রষ্টব্য, অংশত ১, ২ সূত্রও। কিন্তু এরা এক নয়। এদের সম্পর্ক কার্যকারণের। সংযোগের ফলেই প্রভাব।

● সূত্র নির্দেশ ●

১. পাঠক এই আশঙ্কাকে অলীক ভেবে উড়িয়ে দেবেন না। এ যে কত ভীষণ সত্য আগের একটি বইয়ে বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যায় তা বলেছি। এই পুস্তিকায়ও পরে অন্য নানা দিকে সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করা হবে।
২. রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন সাহিত্য। মেঘদূত।
৩. জীবনানন্দ। ধূসর পাণ্ডুলিপি। বোধ।
৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পতুলনাচের ইতিকথা।
৫. নাট্য ক্ষেত্রে ইন্দ্রধ্বজ পুঁতে রাখার প্রতীক তাৎপর্য—ইন্দ্র কর্তৃক অসুরদের নাট্য-ভূমি থেকে বহিষ্করণের বিবরণ (দ্রষ্টব্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র) স্মরণ করা যায়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের আর একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শনের উল্লেখ করছি। লোকউৎস থেকে সংগৃহীত এবং লৌকিক ভাষায় (পৈশাচী ভাষায়) রচিত গুণাঢ্যের গল্পগুচ্ছ 'বৃহৎ কথা' রাজসভায় ধিককৃত হয়েছিল। লেখক বিপুল সেই গ্রন্থটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন।
৬. এখন যাই হোক প্রথমদিকের থিয়েট্রিকাল যাত্রা পৌরাণিক ভক্তিরসকেই প্রধানত আশ্রয় করত।
৭. ছো নাচ, মাইম, লিভিং থিয়েটার-এর ব্যতিক্রমী রূপ পৃথক ভাবে বিবেচ্য।
৮. রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য। সাহিত্যের বিচারক।
৯. রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। সুভা।
১০. রবীন্দ্রনাথ। ভাষা ও ছন্দ।
১১. উপরে রবীন্দ্রনাথের ১নং উদ্ধৃতিতে কি এই দেহের ভাষা বিশেষ করে চোখের কথাই বলা হয় নি?
১২. ইডিয়ট বক্স বলে অনেক তিরস্কার এর ভাগ্যে জুটেছে।
১৩. ক্যাসেটবাহী ফিল্মি গানের জনপ্রিয়তা শ্রমিক বস্তির সাংস্কৃতিক জীবনের একটা উল্লেখ্য দিক। কিন্তু এর মধ্যে সংযোগ কতটা কিভাবে ক্রিয়াশীল তা বিশেষভাবে ভেবে দেখার।

১৪. কনট্যাকট এবং কমিউনিকেশন পৃথক ব্যাপার। ক্রমিক কনট্যাকট-এর ফলে কখন কিভাবে কমিউনিকেশন গড়ে উঠতে পারে, পারে কিনা-সে আলোচনা এখন নয়।
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্ত। একা।
১৬. রবীন্দ্রনাথ। জন্মদিনে। ১০নং কবিতা।
১৭. রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য। সাহিত্যের সামগ্রী।
১৮. রবীন্দ্রনাথ। সে।

পরিশিষ্ট—১

লর্ড লিটনকে লেখা আশুতোষের পত্র

Senate House
Calcutta, 26th March, 1924.

Dear Lord Lytton,

I am in receipt of your letter dated the 24th March, which reached me on Saturday evening after I had returned home from the Convocation. I shall in my reply speak without reserve and hesitation as you have made most unjust and unmerited imputations on my conduct.

Before I record my views on your offer to re-appoint me as Vice-Chancellor and the conditions that accompany it, I shall deal with your remarks on my attitude towards the proposed scheme of legislation. I cannot reproduce here the contents of the correspondence which has passed between you and me on this subject, but it seems clear that you could not have refreshed your memory by its perusal before you criticised my conduct. You could not possibly have forgotten that in the letter which I wrote to you on the 4th November, 1922, after I had received a copy of the University Bill from Mr. Mitter, I expressed in unmistakable terms my disapproval of its contents and the principles underlying it. That Bill came upon me as an absolute surprise. Mr. Mitter, you might remember, asked for my personal opinion. In your letter dated the 8th November, 1922, you distinctly wrote to me that Mr. Mitter had told you that the Senate of the University had been consulted officially but that my personal opinion had not been learned. This, as I intimated to you later, was the exact opposite of truth. This was followed by protracted correspondence and interviews with you in the course of which I explained to you my views upon the draft Bill. At length on the 11th January, 1923, you gave me permission to consult the members of the Senate on the provisions of the Bill. At about the same time I received from you a copy of the Secondary Education Bill; all information regarding its contents, though repeatedly asked for, had been kept back by the Government from the University. The Senate thus placed in possesion of the two Bills, appointed a Committee to report on their provisions. Before the views of the University could be formulated and communicated to you, you adopted, in spite of my earnest protests and the remonstrance of the

Senate, an absolutely indefensible course. You forwarded the Bill or Bills to the Government of India with a view to obtain its sanction to introduce them into the Legislative Council. If you refer to the correspondence, you will find that I and my colleagues on the Senate made a desperate effort to convince you that as the Bills were open to grave objections, theys hould not be adopted as Government measures before full and searching enquiry. Our appeals and protests were totally disregarded. You now make a grievance that I have used every expedient to oppose your Government to arrest the progress of the measures. You complain that I have appealed to the Government of India and the Government of Assam. You will be surprised to hear that what I have done has been perfectly constitutional. In your letter dated the 11th January, 1923, you stated explicitly that I would be free to take what steps I please to discuss the Bill with the members of the Senate. In my reply dated the 14th January, 1923, I stated that in view of the importance of the questions raised, I had decided to give an opportunity to every member of the Senate to discuss the provisions of the Bills. The Senate, it may not be known to you, includes His Excellency the Governor of Assam, the Member of the Council of the Governor-General in charge of the Department of Education, the Minister for Education in Assam and the Director of Public Instruction in Assam. The papers were forwarded as confidential documents to each of these gentlemen. If I had withheld the papers from them, they would have been entitled to make legitimate grievance against me. If the result has been that they have formed an unfavourable opinion of the measures devised by your Government, and have taken such steps as they consider necessary and proper, you may regret it, but surely that is not a ground for complaint against me. You also make a grivance, that I have appealed to Sir Michael Sadler. Your Government, notwithstanding my advice and the advice of the Senate, has unceremoniously rejected the recommendations made by the Commission over whose deliberations Sir Michael Sadler presided. If I have intimated this fact to Sir Michael Sadler, a fact which has been a matter of public knowledge for many weeks past, I did it in the best interests of the University and of the country. Again, you do not hesitate to assert that I have inspired articles in the Press to discredit your Government. This is a libel and I challenge you to produce evidence in support of this unfounded allegation."

You complain that my criticisms have been destructive rather than constructive. Yes, the criticisms have been destructive of the provisions of the Bills which appeared to me and to my colleagues on the Senate to be

most objectionable, framed, as we did not hesitate to record, from a political and not an educational standpoint. You seem to regret that our criticisms have not been constructive, but you have never cared to invite the University to frame a constructive scheme for the benefit of your Government. I have on more than one occasion, as you will no doubt recollect, offered to draw up a Bill with the assistance of my colleague on the Senate and representatives of your Government, but I have received no response. You complain that I have hitherto given you no help. I maintain that I have constantly offered you my help and advice which, for reasons best known to you alone, you have not accepted. I have written to you letter after letter, even in the midst of terrible sorrows, commenting in detail on the provisions of the Bills. You have never cared to reply to the criticisms thus expressed. On the other hand, although I found from your letter dated 11th January, 1923, that you were convinced that the proposed amendments were, as predicted by me, imposible of accomplishment in an amending Bill, I discovered much to my surprise a few days later that you were determined to push on the amending Bill and send it up to the Government of India for sanction. Again, the report of the Committee on the two Bills (which we took great pains to prepare) minutely criticised their clauses and challenged the ideal that lay beneath them. You have never recorded your opinion on our views. You have not even given me the opportunity to discuss the report with you. On the other hand, I cannot overlook that your letter to me dated 15th February, 1923, made it quite clear that you did not realise the gravity of the issue and you did not hesitate to express your impatience at the space that our criticisms occupied. I notice that you charge me with having misrepresented your objects and motives. I most emphatically repudiate this unfounded charge. On the other hand, it would be interesting to know whether, when you stated to the Legislative Council that your 'anxiety to consult the authorities of the University and to obtain their support as far as possible, was responsible for the delay', you were already aware of the attitude taken up by the Government of India. If you have the courage to publish to the world all the documents on the subject and the entire correspondence which has passed between us, I shall cheerfully accept the judgment of an impartial public.

I shall finally consider your offer to re-appoint me as Vice-Chancellor subject to a variety of conditions. There are expressions in your letter which imply that I am an applicant for the post and I am in expectation of re-appointment. Let me assure you that if you and your Minister are

under such an impression, you are entirely mistaken. You ask me to give you a pledge that I shall exchange an attitude of opposition for one of whole-hearted assistance. You are apparently not acquainted with the traditions of the high office which I have held for ten years. I was first called upon to accept the office of Vice-Chancellor by that Godfearing soldier, the late Earl of Minto. He did not bind me with chains but, on the other hand, expressly enjoined me to work in concurrence with the Senate in such manner as might appear to my judgment to be in the truest interests of the University. We had in fact many open conflicts with the views of the Government in those days; you will, however, be interested to know that at the Convocation on the 12th March, 1910, Lord Minto referred to me in the following words: 'Now that my high office is drawing to a close I rejoice to feel that the administration of this great University will continue to benefit from your distinguished ability and your fearless courage.' During the time that Lord Hardinge was Chancellor of the University, we had many an acute difference with the Government, and as Vice-Chancellor I never hesitated to express my disapproval of Government measures when they appreared to me to be injurious to the interests of the University. Lord Hardinge had the generosity repeatedly to congratulate me on the bold stand we had from time to time made against the views maintained by his Government. When two years ago, at the insistent request of Lord Chelmsford and Lord Ronaldshay, I accepted their invitation to hold the post of Vice-Chancellor, I stated distinctly that I would spare no efforts to devote myself to the service of the University and to promote to the best of my judgment and ability the truest interests of my Alma Mater which have been always dearest to me. From the conversation that I had with Lord Ronaldshay at that time, I discovered that no one appreciated more keenly than he the need and value of a thoroughly independent Vice-Chancellor.

Let me assure you that this high tradition was not created by me. It was my privilege to work as a Member of the Syndicate with eight successive Vice-Chancellors during a period of seventeen years, before I was called upon to accept that post, and most, if not all of them, were eminent men imbued with the tradtions of the office from the time of their predecessors. Many of the occupants, ever since the days of our first Vice-Chancellor, Sir James Colvile, Chief Justice of the Supreme Court, have been men who had taken oath to administer justice in the name of their Sovereign. To them it would have been a matter of astonishment to be told that as Vice-Chancellors, they were expected to adapt themselves to

the views of the Government simply because it was the Government which had the appointment in its gift. I have, I maintain, scrupulously adhered to the cherished traditions of my office and it has never entered into my mind during the last two years, that I was seriously expected to adapt myself to the wishes of your Government. Surely, my attitude towards the policy adopted by your Government in the matter of University legislation has been quite familiar to you for some months past, and you have never before this ventured to convey a suggestion to me that my action as Vice-Chancellor has been unworthy of my office. I quite realise that I have not in the remotest degree tried to please you or your Minister. But I claim that I have acted throughout in the best interests of the University, notwithstanding formidable difficulties and obstacles, and that I have uniformly tried to save your Government from the pursuit of a radically wrong course, though my advice had not been heeded. I am not surprised that neither you nor your Minister can tolerate me. You assert that you want us to be men. You have one before you, who can speak and act fearlessly according to his convictions, and you are not able to stand the sight of him. It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government, and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government but he will not certainly enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performances of a Vice-Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, an answer which you and your advisers expect and desire : I decline the insulting offer you have made to me.

Yours sincerely,
Asutosh Mookerjee

পরিশিষ্ট—২

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে তদানীন্তন সভাপতি শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাণী

MESSAGE
from
PRESIDENT, Governing Body
On the occasion of Silver Jubilee Celebration
of the College, 1941
77 Asutosh Mookerjee Road
Calcutta

For a quarter of a century Asutosh College has served the youth of Bengal to the best of its ability. Our ideal is not merely to maintain efficiently an institution that will be the home of academic learning, but also to develop the mind and body of our alumni so as to fit them for active national service. To fight the battle of life there must be a correct appreciation of the realities of the situation. The country needs today more than ever an army of undaunted youths, capable of offering their very best to the cause of its progress. Good conduct, character, discipline and loyalty to the ideals of the college can only develop if there is a true spirit of co-operation among the various elements that constitute the college. On this occasion I confidently call upon everyone to do all he can to make our college worthy of the great name it bears.

Syama Prasad Mookerjee

রজত জয়ন্তীতে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ মহাশয়ের বাণী

MESSAGE

From

Founder PRINCIPAL P. SINHA, M.A., B. L.

on the occasion of Silver Jubilee celebration of the College in 1941

To my old Co-workers

Remember our hard days.

To my younger colleagues

Look to the future.

To my students

Forget not your Institution : Be prepared for work and sacrifice.

Sd. P. SINHA

Principal

Asutosh College,

Bhowanipur.